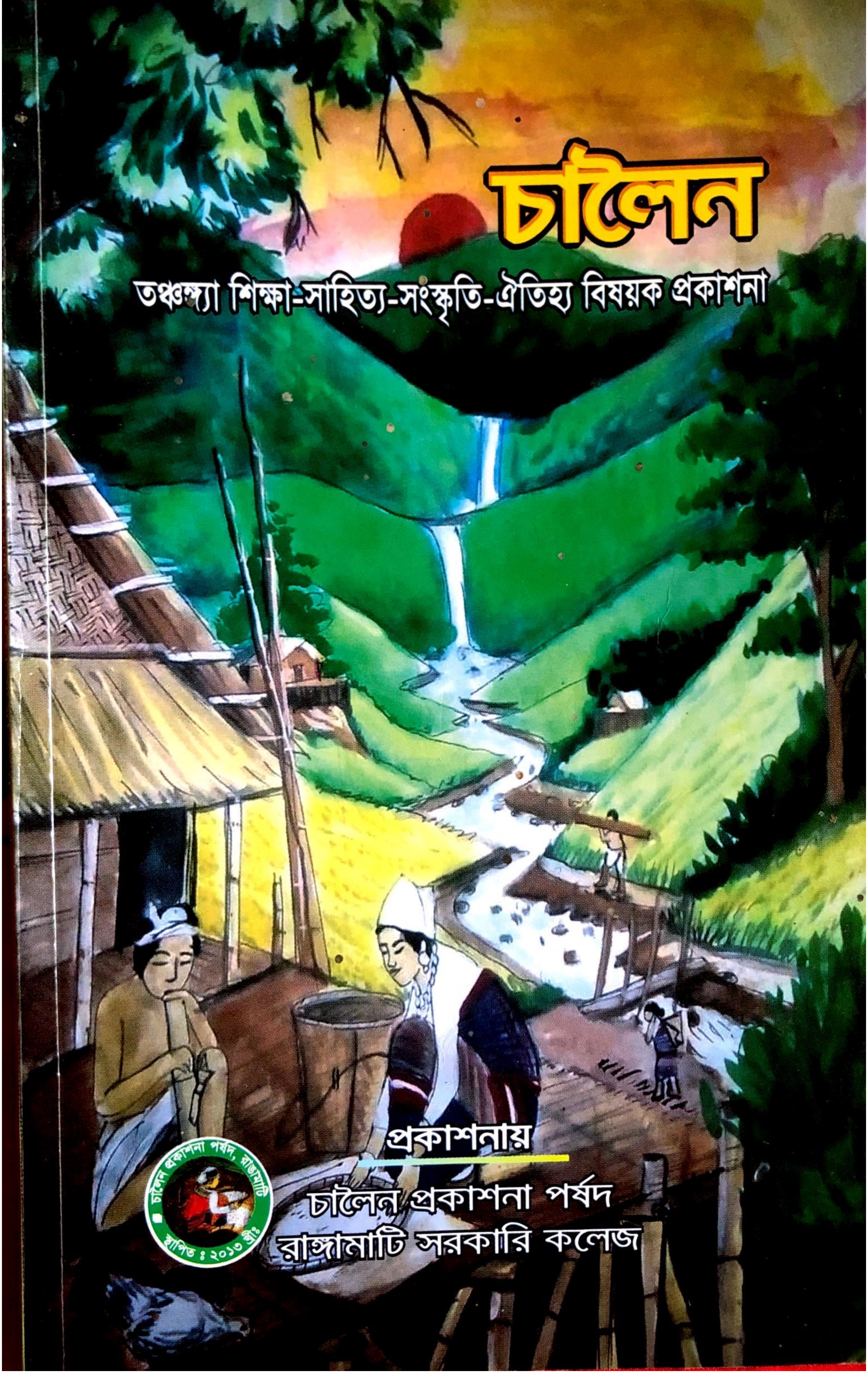

চালৈন
তঞ্চঙ্গ্যা শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা
প্রকাশনায়
চালৈন প্রকাশনা পর্ষদ
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ
স্থাপিত : ২০১৩ খ্রীঃ

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে অধ্যয়নরত তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক চাঙলেন প্রকাশনা পর্ষদ কর্তৃক **"চাঙলেন"** ষষ্ঠ সংখ্যা এর বিশেষ প্রকাশনাকে

স্বাগত জানাই

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ নিজস্ব উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, সংস্কৃতি, কুটির শিল্প, সমাজসেবা, জনস্বাস্থ্য, সমবায়সহ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে পার্বত্য জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছে।

এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বস্তরের জনগণের কাছ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।

বৃষ কেতু চাক্‌মা
চেয়ারম্যান
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

চাৗলৈন

তঞ্চঙ্গ্যা শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা

সম্পাদনায়

দিগন্ত তঞ্চঙ্গ্যা

প্রকাশনায়

চাৗলৈন প্রকাশনা পর্ষদ

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

চাঙমা ছৈলেন

পহেলা বৈশাখ ১৪২৫ বাংলা, ১৪ই এপ্রিল, ২০১৮ ইংরেজী
ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা (বিষু সংখ্যা)

সম্পাদক

দিগন্ত তঞ্চঙ্গ্যা
চাঙমা ছৈলেন প্রকাশনা পর্ষদ

সহযোগিতায়

- আদিলাল তঞ্চঙ্গ্যা
- সাধন তঞ্চঙ্গ্যা
- সুপন তঞ্চঙ্গ্যা
- সরল তঞ্চঙ্গ্যা
- নয়ন তঞ্চঙ্গ্যা
- সুজন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
- চৈনিকা তঞ্চঙ্গ্যা
- জগদীশ তঞ্চঙ্গ্যা
- সুজন তঞ্চঙ্গ্যা
- লক্ষী সাগর তঞ্চঙ্গ্যা
- বিকট তঞ্চঙ্গ্যা
- সোহেল তঞ্চঙ্গ্যা
- সুফল তঞ্চঙ্গ্যা
- রিনি তঞ্চঙ্গ্যা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

বিকেন চাকমা, ঢাকা আর্ট কলেজ,
শিক্ষক, রাঙ্গামাটি ইন্টারন্যাশনাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল

ডিজাইন ও মুদ্রণে

সীবলী অফসেট প্রেস, কাকলী মার্কেট,
কাঠালতলী, রাঙ্গামাটি। ফোন : ০৩৫১৬১৮৮২।

যোগাযোগ

দিগন্ত তঞ্চঙ্গ্যা
তবলছড়ি, পুলিশ লাইন
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ
মোবাইল : ০১৫৫৮৯৪৮৪৩২
E-mail: digontha.rgt@gmail.com

শুভেচ্ছা মূল্য : ১২০ টাকা (ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৬০ টাকা)।

উৎসর্গ



শ্রী স্বর্গীয় যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা
"বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, তঞ্চঙ্গ্যা জাতির গৌরব"

তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রী স্বর্গীয় যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা, পিতা- মৃত: কার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, মাতা- রক্ষিনী তঞ্চঙ্গ্যা। জন্ম ১৫/০৯/১৯৪০খ্রি., মৃত্যু- ০৮/০১/২০১৮ইং। জন্মস্থান রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলার অন্তর্গত রাইংখ্যং এর কুতুবদিয়া গ্রামে। পরবর্তীতে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে রাজস্থলী উপজেলার ডাক্তার পাড়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস। ১৯৬৯ সালে চট্টগ্রামে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর, ১৯৭৯ সালে দিনাজপুরে মহকুমা জেলা প্রশাসক, ১৯৮২ সালে রাজশাহীতে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার ও বগুড়ার গরিয়াকান্দিতে প্রথম উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ১৯৮৩ সালে কুমিল্লায় অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার, ১৯৯০ সালে মৌলভী বাজারে জেলা প্রশাসক, ১৯৯৬ সালে যুগ্ম সচিব ও চট্টগ্রামে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও ১৯৯৯ থেকে ২০০২ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদের প্রথম মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর মৃত্যুতে চালৈন প্রকাশনা পর্ষদ ৬ষ্ঠ সংখ্যাটি **"শ্রী যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা"** নামে উৎসর্গ করা হল।

সম্পাদকীয়

পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে শিক্ষার্থীদের চিন্তা চেতনা, অনুভূতি, বুদ্ধি ভিত্তিক ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে লেখনীর মাধ্যমে। রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের অধ্যয়নরত সকল তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে নিজেদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার এবং শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনী তৎপরতার প্রয়াসকে জাগ্রত করার মানসে **"চাঁলৈন"** প্রকাশনার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এই প্রকাশনা শুধু রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের সীমাবদ্ধ নয়। এটি সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ এমন কি দেশের বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সহ-যোগিতার সম্পৃক্ত। তাই হৃদয় ও মনের সুষ্ঠু আবেগের সঞ্চরণ এবং মননশীলতার সমন্তি উদ্যোগকে সার্থক রূপদান করার মানসে কিছুটা হলেও সাহিত্য চর্চার সুযোগ করে দিতেই **"চাঁলৈন"** এর আত্মপ্রকাশ। আগামী দিনের সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মুখরিত এই সুদীর্ঘ ধারাকে সমুন্নত রেখে নবীন ও সম্মানিত লেখকদের কাছে **"চাঁলৈন"** হোক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে দৃপ্ত পদভারে এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রদর্শক। এটি মেধা ও মননশীলতার এমন কি নিজস্ব জাতি স্বত্তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য উন্মেষ ঘটিয়ে শৈল্পিক সত্তার অন্তর্নিহিত চেতনাকে বিকশিত করে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক সৃষ্টি এবং আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয় হোক।

যারা আমাদের এই প্রকাশনার জন্য মূল্যবান লেখা, সময়, শ্রম, বিজ্ঞাপন এবং অর্থ প্রদান করে প্রকাশনাকে দৃষ্টি নন্দিত ও শোভাবর্ধনে সহযোগীতা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সংকলনে প্রকাশিত, লেখাগুলোর বক্তব্য লেখকদের একান্তই নিজস্ব। লেখার ব্যাপারে সম্পাদনা পরিষদ কোনভাবে দায়ী নয়। আর যাদের লেখা ইচ্ছা থাকার সত্ত্বেও সীমাবদ্ধতার কারনে আমরা ছাপাতে পারিনি সেই জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

আমাদের প্রকাশনাকে সার্থক করতে প্রচেষ্টার কোন কমতি ছিলনা। সর্বোৎকৃষ্ট চেষ্টার সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং মুদ্রণজনিত ক্রুটি পরিলক্ষিত হলে পাঠক মহল ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

পরিশেষে, বৈসুক, সাংগ্রাই, বিঝু, বিষু, বিহু নিয়ে আসুক অনাবিল সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি। সবাইকে "চাঁলৈন প্রকাশনা পক্ষ থেকে- **১৪২৫ বাংলা নববর্ষ ও বিষুর** শুভেচ্ছা রইল।

দিগন্ত তঞ্চঙ্গ্যা
সম্পাদক
চাঁলৈন প্রকাশনা পর্ষদ
রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ
রাঙ্গামাটি।

সূচিপত্র

কবিতা (বাংলা ভাষায়):

তঞ্চঙ্গ্যা : ইতিহাস ও ঐতিহ্য

- অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান। ১৩,২৯৫ বর্গ কি.মি (৫,০৮৯ বর্গমাইল) আয়তনের পার্বত্য চট্টগ্রাম অপরূপ শোভায় শোভিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন ও অফুরন্ত সম্পদে ঋদ্ধ বাংলাদেশের একটি অনন্য সাধারণ জনপদ পার্বত্য চট্টগ্রাম। উঁচু-নিচু, পাহাড়-পর্বত, সবুজ বন-বনানী, নদ-নদী-হ্রদ আর জীব-বৈচিত্র্যময় নানারকম পশু-পাখির সমারোহ ছাড়াও এতদাঞ্চলের আকর্ষণীয় নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সমৃদ্ধ জীবনাচরণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের অনন্যসাধারণ নৈসর্গিক একটি দর্শনীয় পীঠস্থান বা অঞ্চলে পরিণত করেছে। ১৮৬০ সালে এটি একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে এর জন্ম হয়। বর্তমানে এটি তিন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বিভক্ত।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান তিনটি পার্বত্য জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত। প্রায় দুইশ বছরের অধিকাল ধরে অঞ্চলটি Chittagong Hill Tracts District হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের এক দশমাংশ ভূমি আয়তন বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়, অরণ্য ও নদী উপত্যকা পরিবেষ্টিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে দশটি ভাষাভাষি অবস্থান তন্মধ্যে ১৩টি জুম্ম জাতি বা পাহাড়ী জাতি (যদি তঞ্চঙ্গ্যা, উসুই ও রিয়াংদের আলাদা আলাদা জাতি হিসেবে ধরা হয়) বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিগুলো হলো : চাকমা (চাংমা, চাঙমা), মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো বা মুরং, বম (বনযোগী), খুমি, খ্যাং বা খিয়াং, চাক (সাক), তঞ্চঙ্গ্যা, লুসাই (কুকি), রিয়াং ও উসুই (ত্রিপুরা জাতির শাখা) এবং পাংখো (পাংখোয়া)। কিন্তু বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে স্বীকৃত জনগোষ্ঠী এগারোটি। উপরি-উক্ত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী কম-বেশী প্রতিটি পার্বত্য জেলায় বসবাস করে। ক্যাপ্টেন টি. এইচ লুইন ১৮৬৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জীবনধারা ও তাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসময় তিনি সরকারী কাজের জন্য তৈরী রিপোর্টগুলোতে জনগোষ্ঠীটিকে বিশেষ দুই শ্রেণিতে বিভাজন করে দেখিয়েছেন। যেমন : ক. খ্যাথাং বা ক্ষিয়োঙ্থা (Khyoungtha) অর্থাৎ, নদীর সন্তান এবং খ. টংথা বা তুয়োঙ্থা (Toungtha) অর্থাৎ, পাহাড়ের সন্তান। নিচে তা দেখানো হলো।

মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠী

খ্যাংথা বা নদীর সন্তান		টংথা বা পাহাড়ের সন্তান		
চাকমা	মারমা	লুসাই	ম্রো	ত্রিপুরা
তঞ্চঙ্গ্যা	রাখাইন	বম	খুমি	উসুই
দৈনাক	------	পাংখোয়া	খ্যাং বা খিয়্যাং	চাক

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সকল জাতিসত্ত্বা সুদূর অতীতকাল থেকে স্ব-স্ব পরিচয়ে নিজেদের পরিচয় দেয়। তারা তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে পরম যত্ন সহকারে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। এরা খর্বকায়, এদের গালের হার উন্নত, মাথার চুল কালো, ছোট চোখ সর্বোপরি শারীরিক গঠন ও আকৃতির দিক থেকে এরা মঙ্গোলীয় জাতির বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে ফরাসী নৃবিজ্ঞানী Pierre Bessaignet বলেন :

'The Hill Tracts Tribes men are ethnically different from the settled in the East Pakistan. They have closer links with hilly peoples of that vast region that extends from Tibet to Indo China. They are short in stature, have black hair, prominent cheekbones and narrow eyes- features that remined one of the `Mongoloid.'

বাংলাদেশের প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য হিসেবে খ্যাত পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা অন্যতম। রাঙ্গামাটি জেলার মানিকছড়ি, বিলাইছড়ি, বেতবুনিয়া, ওয়াগ্গা, কাপ্তাই, রাজস্থলী, রাইখালী আবিষ্কারী এবং বান্দরবান জেলার বালাঘাটা, সুয়ালক, রোয়াংছড়ি, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, পাইন্দু, রেমাক্রী প্রভৃতি স্থানে তঞ্চঙ্গ্যারা বসবাস করে আসছে। তাছাড়া কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বসতি রয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে (দক্ষিণ ত্রিপুরা) এবং মিজোরাম রাজ্যের চাকমা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (সিএডিসি) অঞ্চলে রয়েছে তাদের প্রধান বসতি। বার্মার (মায়ানমার) বর্তমান আকিয়াবের সিত্তুয়ে জামপুই হিলের দক্ষিণে কোলদান নদীমুখ অবধি স্থানে তাদের বসতি ছিল। তাছাড়া আরাকানের ভুসিডং, রাচিডং মংডু, ক্যক্ত, তানদুয়ে, ম্রামাসহ আরো কয়েকটি এলাকায় প্রাচীন কাল থেকে বসবাস করে আসছে। তাছাড়া মিজোরাম এবং মণিপুরের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলেও তাদের সংখ্যা সমধিক। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যা মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠীর দলভূক্ত।

এটা স্বীকার্য যে, পাবর্ত্য চট্টগ্রামে বসবসারত প্রায় সকলেরই ইতিহাস-ঐতিহ্য শুরু হয় আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। এ সময় সেখানে বসবাসরত পূর্বপুরুষের আগমনপূর্বক আচার-আচরণ দেখে আরাকানীরা হেঁয়ালিভাবে বলতে শুরু করে

তংচংয়্যা। পরবর্তী সময়ে এটি পরিমার্জিত হয়ে তংচংয়্যা > তন্চঙ্যা > তংচংয়্যা > তঞ্চঙ্গ্যা কিংবা তৈনছংগ্রা > তঞ্চঙ্গ্যা হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, পনের শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল প্রায় দেড়শত বছর। এছাড়া অঞ্চলটি তৎকালীন দান্যাওয়াদির সন্নিকট (আরাকানে অবস্থিত) ও ভূ-প্রকৃতিগত ভাবে প্রায় সমরূপ অঞ্চল বলে সুদূর অতীতকাল থেকে বার্মা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চল সমূহে দৈননাকদের বসবাস শুরু করতে পারে। জনশ্রুতি রয়েছে, এ অঞ্চলে এসে মাতামুহুরী নদীর আদরের তৈনগাঙ-এ (মারমারা বলেন তৈনছং) তারা সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে তারা সেখান থেকে পশ্চিম ও উত্তর দিকে বিস্তার লাভ করে। তৈনছংয়ের অধিবাসী বলে তৈনছংগ্রা (তঞ্চঙ্গ্যা) নামে সবাই ডাকতে শুরু করে। এভাই তারা তঞ্চঙ্গ্যা নামে পরিচিতি লাভ করে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, মারমা, রাখাইন এবং বার্মিজরা (মায়ানমারের অধিবাসী) এখনো তাদের 'দৈননাক' নামে সম্বোধন করে। তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা পূর্বে অভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় মিশ্র ভাষায় কথা বলে। তাদের ভাষায় মূল উৎস হচ্ছে পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত ইত্যাদি। এছাড়া ভারতীয় আর্যভাষা থেকে অনেক শব্দ বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তবে, প্রবীন তঞ্চঙ্গ্যারা আরাকানি ভাষায় কথাবার্তা বলে তাদের মনের ভাববিনিময় করে। নবীন তঞ্চঙ্গ্যারা চাকমাদের অনুকরণে ভাষা ব্যবহার করে।

এখানে বিশষভাবে উল্লেখ থাকে যে নিম্নলিখিত কারণে তঞ্চঙ্গ্যা একটি আলাদা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত অপরাপর জুম্ম জাতিগুলোর ন্যায় তঞ্চঙ্গ্যা জাতিরও গছা গোষ্ঠী ও ডেল রয়েছে;
খ. তঞ্চঙ্গ্যাদের (বিশেষত তঞ্চঙ্গ্যা রমনীদের) অন্যান্য জাতি থেকে আলাদা/ স্বতন্ত্র পোশাক-পরিচ্ছেদ রয়েছে;
গ. তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তি থেকে বর্তমান অবধি একটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে;
ঘ. তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে যা অপরাপর সকল জাতির ভাষা থেকে পৃথক ;
ঙ. তঞ্চঙ্গ্যাদের বহমান সাংস্কৃতিকধারা উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে ;
চ. তঞ্চঙ্গ্যা সাহিত্য ভান্ডার ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে ;
ছ. দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তঞ্চঙ্গ্যাদের আলাদা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও প্রচারিত হয়ে আসছে।

সরকারী নথিপত্রে বৃটিশ আমল থেকে তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় আলাদা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তারা অপরাপর জাতির ন্যায় সরকারী উদ্যোগ ও আত্মপ্রচেষ্টায় নিজেদের অস্তিত্ব স্বতন্ত্রভাবে প্রতিভাত করে। বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যারা একটি স্বতন্ত্র জাতি সত্ত্বা হিসেবে স্বীকৃত। 'জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্বআদিবাসী বর্ষ ১৯৯৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আদিবাসী সম্মেলন কর্তৃক তঞ্চঙ্গ্যাদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

তঞ্চঙ্গাদের বংশ পরিচয় পিতৃতান্ত্রিক বা পিতৃসূত্রীয়। তাদের সর্বমোট ১২টি গোত্র রয়েছে। তারা গোত্রকে 'গসা' বলে। এই হিসেবে তাদের বারোটি 'গসা' রয়েছে। গসাগুলো হলো যথাক্রমে : ১. মোঅ গসা, ২. কারওয়া গসা, ৩. ধন্যা গসা, ৪. লাং গসা, ৫. মেলং গসা, ৬. মংলা গসা, ৭. অঙ গসা, ৮. তাসসি গসা, ৯. রাঙ্যা গসা, ১০. লাপোস্যা গসা, ১১. মুলমা গসা এবং ১২. ওয়াহ গসা। একেকটি গসা আবার অনেকগুলো গোষ্ঠী বা গুত্তিতে বিভক্ত। যেমন : মোঅ গসা'র গোষ্ঠী বা গুত্তি হলো : ক. তাসি গুত্তি, খ. দাল্লোআ গুত্তি, গ. আগার গুত্তি, ঘ. কুরগা গুত্তি, ঙ. গন্যা গুত্তি, চ. আগা গুত্তি, ছ. খুস্সা গুত্তি, জ. কবলা গুত্তি ইত্যাদি। আবার কারওয়া গসার গুত্তি বা গোষ্ঠীগুলো হলো -ক. আরওয়া গুত্তি, খ. গসালা গুত্তি, গ. বলা গুত্তি, ঘ. বাঙ্গালা গুত্তি, ঙ. ফ্রাংসা গুত্তি, চ. লাম্বায়া গুত্তি, ছ. বকচারা গুত্তি, জ. বুঙ গুত্তি, ঝ. লাপোস্যা গুত্তি এবং ঞ. বৌ গুত্তি ইত্যাদি। উপরি-উল্লিখিত বারোটি গসার মধ্যে বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টা গসার লোকেরাই বসবাস করে। ছয়টি গসা বা গোত্র এককালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করলে ও চাকমারাজা ধরনবক্স খাঁর আমলে আবার আরাকানে চলে যান। কেন আরাকানে চলে যান এ বিষয়ে তেমন কোনোরূপ মন্তব্য বা তথ্য পাওয়া যায়নি। একদল লোক উনিশ শতকের মধ্যভাগে আরাকান থেকে চলে আসে এবং ১২০ নং ছাক্রছড়ি মৌজায় বসতি স্থাপন করেন।

অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ন্যায় তঞ্চঙ্গ্যাদের পোশাক-পরিচ্ছদে বিশেষ একধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তঞ্চঙ্গ্যা রমনীদের পরিধানের বস্ত্রটির নাম 'পিনন' বা 'পিনুইন'। আবার কেউ কেউ পরিধেয় বস্ত্রকে বলে 'পেনুইন'। তঞ্চঙ্গ্যা রমনীর পরিধানের বস্ত্রটির মাপ নিম্নরূপ :

বস্ত্রের নাম	ব্যবহার	আদর্শমাপ (গড়)	রঙ ও নক্‌শার ধরণ
পিনন/ পিনুইন/ পেনুইন	তঞ্চঙ্গ্যা রমনীদের গামছা জাতীয় নিম্নাবাস।	১.৪৩ মি ঢ ৯১ সে. মি	চওড়া কালোবর্ডার সম্বলিত লাল জমিনের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল হলুদরঙের চিকন ডোরার সমাবেশ। এর প্রান্তদেশে একটি চওড়া লাল অংশ থাকে।
			দুই প্রান্ত আনুমানিকভাবে কালো ও ভিতরের দিকে লালরঙের মাঝখানে লাল ও হলুদে একই মাপের দুই বর্ডার থাকে। কয়েক নাল সবুজ, বেগুনি, আকাশী রঙমিশ্রিত প্রশস্থ প্লাটফরম থাকে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছেদ ও অলংকারে পরিপূর্ণ। বিশেষত তঞ্চঙ্গ্যা মহিলাদের পোশাকে বৈচিত্র্যতা রয়েছে। চাকমা মহিলা কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত অন্যান্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জনজাতির উপজাতি মহিলাদের মধ্যে থেকে পোশাকে আচ্ছাদিত তঞ্চঙ্গ্যা রমনীকে খুব সহজেই চেনা যায়। তঞ্চঙ্গ্যা রমনীরা পায়ে, হাতে, (কনুই), বাহুতে, গলায়, কানে, চুলের খোপায় নানাবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করে। পায়ে রূপার তৈরী মল, (ট্যাঙের খাড়-) পরিধান করে, কব্জি/কনুই বা হাতে রূপা বা সোনা তৈরী কুচি খাড়- (বেড়েইয়া খাড়-), বাঘোর, কিঞ্চিক, বাঙড়ী বা চুড়ি ব্যবহার করে। বাহুর মধ্যে বাজুবন্ধক বা তাজজোড় পরিধান করে। কানে পরিধান করে রাজজুর/রাজজোড় কিংবা ঝংগা। গলায় চন্দ্রহার বা হাঁচুলি ইত্যাদি পরিধান করে। তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় বর্তমানে এই সব ব্যবহার প্রায় এখন বিলুপ্তির পথে।

আদিকাল থেকে তারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। বার্মায় (বর্তমানে মায়ানমার) দৈননাক হিসেবে পরিচিত থাকার সময়েও তাদের একমাত্র ধর্ম ছিল মহামতি গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম। তারা বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পূর্ণিমাসমূহ অত্যন্ত ধর্মীয়-গাম্ভীর্যের সাথে পালন করে। তারা ধর্মীয় দিক দিয়ে বৌদ্ধ হলেও সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী হয়ে অনেক তঞ্চঙ্গ্যা গাঙ পূজা, ভূত পূজা, মির্তিনী পূজা, লক্ষ্মী পূজা ইত্যাদি পূজা করে। উক্ত পূজা সম্পাদনার্থে সমাজজীবনে একধরনের লোক থাকে তাদেরকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বৈদ্য বা অসা (ওঝা) বলে। তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী প্রথা প্রায়ই চাকমাদের মতো । অর্থাৎ, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার পদ্ধতি। তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে রয়েছে সামাজিক আইন। রয়েছে বৈধ বিবাহঘটিত জাতীয় বিচার পদ্ধতি। তাছাড়া আরো রয়েছে অবৈধ বিবাহ ঘটিত জাতীয় বিচার ও দন্ডবিধি প্রদান। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় ক্রমশঃ অগ্রসরমান। তবে বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে আরো এগিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষায় মনোযোগী হতে হবে। কেননা, শিক্ষা ব্যতীত সমাজ কখনো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। সকলের মঙ্গল হোক।

তথ্য উৎস

১. প্রদীপ্ত খীসা, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা (ঢাকা : ১৯৯৬)
২. ফরিদ শাওন, চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া সম্পাদিত, সমুজ্জ্বল সুবাতাস -সংখ্যা-১৮ (বান্দরবান : ২০১০)
৩. অধ্যাপিকা সুফিয়া অনূদিত খান, প্রফেসর পিয়ের বেসেইনে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি, বাংলা একাডেমী (ঢাকা : ১৯৯৬)
৩. Pierre Bessaignet, Tribes Men of the Chittagong Hill Tracts, Asiatic Society of Pakistan (Dhaka: 1958), P. 5

৪. ইউ আর কায়েস, আদিবাসী দৃষ্টিপাত (রাঙ্গামাটি : ২০০৩)
৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সংক্রান্ত প্রথা ও রীতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক (রাঙ্গামাটি : ২০১৩
৬. রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা, তঞ্চঙ্গ্যা জাতি (বান্দরবান : ২০০০)
৭. মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পদিত, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, প্রবন্ধ : তঞ্চঙ্গ্যা, দীননাথ তন্‌চংগ্যা,
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীমালা-৫ (ঢাকা : ২০০৭)
৮. T H. Lewin, The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein (Calcutta: 1869)
৯. পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সংক্রান্ত প্রথা ও রীতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক (রাঙ্গামাটি : ২০১৩)
১০. মোঃ মোশারফ হোসেন চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর (ঢাকা : ১৯৯৯)

লেখক : চেয়ারম্যান, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Tourism in the Chittagong Hill Tracts, Dubai, and Barcelona: The Question of Power Structure, the Clash between Neo-liberalism and Cultural Conservatism

Anurug Chakma

There is a strong debate on the question about whether tourism facilitates development or brings adverse impacts in the society. It is also the question of power structure in this sense that who want tourism and who resist tourism. Beyond this, this question brings another controversy between neo-liberal development agents and cultural Conservatists. Both positions against/ in favor of tourism are realistic and reasonable enough since we have ample evidences of both groups. Let us dig into the debate.



Tourism is one of the fastest growing sectors of economic development all over the world since it provides a number of economic benefits to rural areas and developing countries. As the pictograph shows, tourists spend million dollars on their transport, restaurant, food, accommodation and immigration service etc. which accelerate economic development of a country. Even this sector serves as an income-generating source of local people.

Despite these positive impacts of tourism, anti-tourism sentiment is a global reality as it is observed in Dubai, and Barcelona. The CHT is also now a global exemplary case of anti-tourism movement where people have negative perceptions about tourism. Interestingly, these three places are far away from one another but how they are similar in terms of their anti-tourism policy. Let's talk about comparison amidst these three cases. **Tourists Go Home and Tourism is Killing Neighborhood** – are slogans of anti-tourist protest in Barcelona and Catalonia, Spain. Why is

resistance against tourism in Barcelona if it is considered as an integral part of the entire development process? Why do local people hate tourists? Come to that discussion. The average monthly income of young Spaniards is no more than 1000 euro but the house rent is 800 euro or more due to tourism. Commodity price is also high due to tourists. Above all, capital and tourist industry have hardened the life of working class people in Barcelona which is reflected again in a public opinion survey. It has been found that 19% of residents of Barcelona identified tourism as their top problem.1 Another study also reports that Dubai, one of the top tourist destinations in the world, is confronting cultural conflicts since many Western tourists come here to enjoy their life but cultures of tourists mismatch with existing Muslim norms and social values of Dubai. For example, homosexuality, kissing in public places and affairs outside marriage are punishable offences in Dubai whereas Western societies allow these social activities.2 Does the CHT face problems of Barcelona, and Dubai cities? The following paragraph is the answer of a key resource person (35) of Bandarban about how local people view tourism in the CHT.

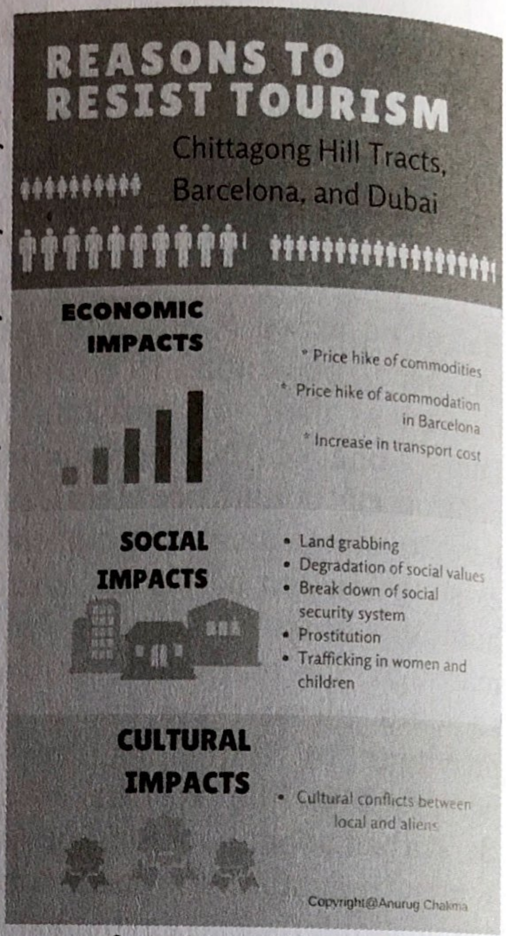
Tourism might be the main source of trafficking in women and degradation of social environment in Bandarban. Beyond this, local people are being displaced from their homesteads due to acquisition of their lands in the name of tourism. Basically, large companies and the Bangladesh Army are involved with tourist business in the CHT. A large number of people will be uprooted in future too. For instance, the Nilachal tourist spot was a Tanchaungya indigenous village before. We are unable to protect our land and protect

1 Peter, Laurence (2017) "Tourists Go Home: Leftists Resist Spain's Influx", available at: http://www.bbc.com/news/world-europe-40826257, accessed on March 12, 2018.

2 Anttila, Heidi "Cultural Differences and Conflicts in Tourism: Case Study Dubai",
http://www.travel-conference.co.uk/ commentries.php?paper=58#.WqZowXeYPIU, accessed on 12 March 2018.

ourselves. In addition, Faruk Para and other nearby villages of Bandarban are experiencing movement of strangers in their localities. These strangers are coming here by car and sometimes giving mobile phones to innocent and unconscious girls as gifts of deception. They are making dishonest relationship with local women for trafficking purpose.3

These three case studies give us a number of insightful findings on anti-tourism local sentiment and protest such as price hike of accommodation and commodities, degradation of social values, cultural conflict, land grabbing, break down of social security system and tracking of women and children. I said earlier that the issue of tourism is a battle between powerless and powerful, between ruler and ruled, and between neo-liberal development agents and cultural Conservatists. Now choose your position on this issue. Do you want tourism and economic development? Or, will you stand in favor of protection of culture, social security and comfortable life of local communities? Which should come first? If you want both, how can it be possible? Should the government then make a policy dialogue with local communities and other stakeholders?



3 Interview, Bandarban, June 19, 2017.

You will decide your own position on this debate but I would like to remind all of you the concept of GENERAL WILL given by Jean-Jacques Rousseau in his "social contract theory". Resistance, protest and movement are natural and morally accepted when it is waged against that authority which works in oppose to common good or common interest of the society. Despite expectation, government does not work always for the sake of common interests. Jeremy Bentham and John Austin also advocate for resistance against government if it is necessary for bringing positive outcome in the society with reference to American Revolution (1775-1783) and French Revolution (1789-1799) that emancipated human beings from state repression and exploitation.

Author: Anurug Chakma, Assistant Professor, Department of Peace and Conflict Studies, University of Dhaka.

উৎসব সংস্কৃতির প্রাণ

- অনির্বাণ বড়ুয়া

সংস্কৃতি মানবজীবনের সঙ্গে খুব বেশি সংশ্লিষ্ট। জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ সংস্কৃতি। ইহা হচ্ছে মনুষ্যত্বের নির্যাস, মানবতার প্রতীক। মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য সংস্কৃতির প্রয়োজন; সমাজ ও সভ্যতার উৎকর্ষতার জন্য সংস্কৃতি আবশ্যক। উৎসব সেই সংস্কৃতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ- অনিবার্য উপাদান। মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি উভয়কে পূর্ণতা দিয়েছে এই উৎসব। ইহা জীবন এবং সংস্কৃতিকে প্রাণময় করে তোলে- মানুষকে রুচিবান ও সংস্কৃতিবান করে; জীবনকে করে পরিশীলিত। মানুষকে নতুনভাবে জেড়ে ওঠার সাহস ও প্রেরণা দেয়; দেয় বেঁচে থাকার শক্তি। কাজেই মানুষের জীবন, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে উৎসব খুব অপরিহার্যরূপে জড়িয়ে আছে। সেটি একান্ত উপলব্ধির বিষয়।

মানবমনীষা থেকে সংস্কৃতি উৎসারিত হয়। মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, মনন-মনীষার সমন্বিত ফসল যে সংস্কৃতি তা তার জাতিগত, গোষ্ঠীগত, গোত্রগত, বর্ণগত, ভাষাগত, ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক বলয়ে সীমাবদ্ধ আচার-আচরণ অর্থাৎ জীবনাচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। জীবনের নানামুখী প্রয়োজনেই সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। দেশ, ভূগোল, জাতি, বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল, ভাষা গোষ্ঠী প্রভৃতি ভেদে আমরা সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও পরিচয় চিহ্নিত করি। উৎসবও তা-ই এগুলো ভেদে উৎসব স্বতন্ত্র ও বিচিত্র হয়। বিচিত্র উৎসবের যেমন বিচিত্র স্বাতন্ত্র্য থাকে তেমনি তাদের মধ্যে কিছু অতি সাযুজ্যপূর্ণ মিল বা সামঞ্জস্যও থাকে। এগুলো মানুষকে কাছে টানে। এরা মানুষে মানুষে সম্প্রীতির সম্পর্ক তৈরি করে দেয়। রচনা করে মৈত্রী, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য ও মানবতার সেতুবন্ধ। উৎসব হয়ে উঠে মানুষের কাঙ্ক্ষার বিষয়। সারা বছর মানুষ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা কখন উৎসব আসবে। ইহজাগতিক ও পারত্রিক জীবনসম্বন্ধীয় শুভ এবং শ্রেয়চেতনার যে সামষ্টিক রূপ আর বিচিত্র মাত্রা তার বাস্তব অভিব্যক্তি ঘটায় উৎসব-অনুষ্ঠান।

উৎসব সংস্কৃতির ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ- সংস্কৃতিরই একটি রূপ- একটি উপাদান। সংস্কৃতি যেমন মানুষের চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-মনন, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণের প্রসূণ একইভাবে উৎসবও মানুষের শুভচেতনা, জীবনবোধ আর জীবনাচারের ফসল। সংস্কৃতি যেমন মানবজীবনের প্রয়োজনবোধের অংশ তেমনি উৎসব-পর্বাদিও মানুষের প্রয়োজনেই হয়। সংস্কৃতি যেমন মানুষের প্রাত্যহিক, ব্যবহারিক, মানসিক তথা সামষ্টিক জীবনচর্যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেমনি উৎসবও মানুষের জীবনের জন্য অশেষ কল্যাণ ও তাৎপর্যের বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়।

সংস্কৃতি এবং সভ্যতার দুটি দিক আছে- একটি হচ্ছে মানসিক, আর একটি প্রাত্যহিক জীবনাচার সংক্রান্ত অর্থাৎ ব্যবহারিক। প্রথমটি মানবিক সংস্কৃতি আর পরেরটি ব্যবহারিক সংস্কৃতির অন্তর্গত। মানবিক সংস্কৃতির মধ্যে মানবীয়

গুণাবলির তথা মানবিক বৈশিষ্ট্য সমূহেরই চর্চা হয়। মৈত্রী, প্রেম, সততা, সুরুচি, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, স্নেহশীলতা, দয়া-মায়া, মমতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব-ভ্রাতৃত্ব, সাহায্য-সহযোগিতা, মহানুভবতা, পরোপকার এগুলো মানবিক সংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত। জীবনে এর যথার্থ চর্চার ফলে হিংসা-ঘৃণা-দ্বেষ-নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি অশুভ জিনিসের নিয়ন্ত্রণ হয়। উৎসব মানবিক সংস্কৃতি চর্চার সেই কাজটি সম্পন্ন করে দেয় মানুষের জন্য। অপরদিকে মানুষের জীবনের ইহজাগতিক বৈষয়িক জিনিসগুলোর ব্যবহারিক গুরুত্বই হলো ব্যবহারিক সংস্কৃতি। এগুলোকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সঠিক ব্যবহারের জন্যও চাই জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, সাহস, শক্তি, উদ্যম, প্রেরণা, সংযম, ত্যাগ, উপলব্ধি, নিয়ম, নীতি-নৈতিকতা আর রীতিরেওয়াজ। সেই বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়ে দেয় উৎসব। দুই সংস্কৃতিকেই উৎসব পূর্ণতা দান করে এবং মাহাত্ম্য দেয়। ইহা মানবিক ও ব্যবহারিক দুটি সংস্কৃতিরই পরিপূরক। উভয় সংস্কৃতিই মানুষের চিন্তন-মনন, মনীষা-মনস্বিতা ও চর্চা-অনুশীলনের অবদান। সংস্কৃতিমাত্রই সার্বণিক সৃজনশীলতা। জীবনের গতিশীলতাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি নতুনত্ব, বৈচিত্র্য, প্রসারমানতা এনে দেয় মানুষের জীবনে। তাই সংস্কৃতি মানেই জীবনের প্রাগ্রসর প্রবহমানতা। উৎসব সেই অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে, নবায়ন করে সৃজনশীলতাকে।

সংস্কৃতি ও উৎসব আমাদের জীবনের সম্পদ; আমাদের বেঁচে থাকা ও সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণার উৎস। আমাদেরকে উৎসব পালনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয় ওই সংস্কৃতি। উৎসব আমাদেরকে সুরুচিবান ও সংস্কৃতিপরায়ণ হতে শক্তি জোগায়; নতুনভাবে পথ চলতে সাহস সঞ্চার করে। সংস্কৃতি মানুষে মানুষে যে মানবিক সম্পর্ক ও বন্ধন তৈরি করে তা অটুট রাখে উৎসব। সংস্কৃতি ও উৎসব একসূত্রে গ্রথিত। একে অপরের সহায়ক। উভয়ে সতত একাত্ম হয়ে আছে নিবিড় সম্পর্কে।

মানুষ সবসময় আনন্দে বাঁচতে চায়। আনন্দ ও সুন্দরের কামনা মানুষের সহজাত। আনন্দবোধ ও সৌন্দর্যবোধ মানুষের জীবনে প্রাণশক্তি বয়ে আনে। এরা মানুষকে সুন্দরভাবে বাঁচিয়ে রাখে; রাখে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত। আর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা সেই আনন্দবোধ ও সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করে। উৎসবে জীবন আর সংস্কৃতির সুন্দর, ব্যঞ্জনাময়, আনন্দময় এবং প্রাণময় অভিপ্রকাশ ঘটে।

বিষু উৎসবের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়। প্রতিবছর আমরা বিষু উৎসব পালন করি। এই শুভ উৎসব থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে শুভবোধে জেগে ওঠে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। সংস্কৃতি ও উৎসবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সবাইকে সুন্দর একটি মানবিক সমাজ গঠনে কাজ করতে হবে। জীবনবোধ, সংস্কৃতিমানতা ও উৎসবপ্রিয়তায় ঋদ্ধ হতে হবে আমাদেরকে। উৎসব সবার জন্য

আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। এর সার্বজনীন আবেদন, আকর্ষণ ও সৌকর্য চিরন্তন। এর সৌন্দর্য শাশ্বত। একে সবার কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে কাজে লাগাতে হবে। উৎসবের মঙ্গলবার্তাকে সকলের জীবনে পৌঁছে দিতে হবে। সবার জীবন সংস্কৃতির আলোয় উদ্ভাসিত হোক। উৎসবের আনন্দে ভরে উঠুক সবার জীবন।

[অনির্বাণ বড়ুয়া : সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ, রাঙ্গামাটি।]

প্রাচীন বাংলার বন্দর নগরী হিসেবে তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্যের সন্ধান মূলক একটি সমীক্ষা

মো. আশিকুজ্জামান খান কিরন
প্রভাষক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
kiron85bd@gmail.com

ভূমিকা

বৌদ্ধ ও বৌদ্ধোত্তর প্রাথমিক যুগে প্রাচীন ভারতবর্ষের ছোট-বড় সমস্ত জনপদ মোটামুটি ৫ টি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত ছিল। যথাঃ ১. মজ্ঝিম দেশ বা মধ্য ভারত; ২. উত্তরাপথ বা উত্তর ভারত; ৩. অপরান্ত বা পশ্চিম ভারত; ৪. প্রাচ্যদেশ বা পূর্ব ভারত; ৫. দক্ষিণাপথ বা দক্ষিণ ভারত।১ এ যুগের প্রাচ্যভূমি বা পূর্ব ভারতকে ৬টি রাজ্যে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো হল : ১. কামরূপ; ২. সমতট; ৩. তাম্রলিপ্তি; ৪. কর্ণসুবর্ণ; ৫. উড়িষ্য; ও ৬. গঞ্জাম দেশ। ২ তবে বাস্তবে তৎকালে এ সংখ্যা আরও বেশি ছিল। নিম্নে তাম্রলিপ্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

বিবিধ গ্রন্থে তাম্রলিপ্তি

প্রাচীন বাংলার সুবিখ্যাত বন্দর নগরী তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত।[৩] ইতিহাসে এর সুনির্দিষ্ট ও একক কোন নাম পাওয়া যায় না।[৪] বরং প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ ও অপরাপর লেখনীতে 'তাম্রলিপ্তি' নামের বিভিন্নতারই ছড়াছড়ি।[৫] 'মহাভারত' এ ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে 'তাম্রলিপ্তি'র সর্বপ্রথম উলেখ পাওয়া যায়।[৬] জৈন 'প্রজ্ঞাপনা'য় 'তামলিত্তি'কে 'বঙ্গে'র অন্তর্গত বলা হয়েছে।[৭] 'মহাবংসে'র (১৯। ৬) নং থেকে জানা যায় যে, সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩৬ অব্দ) সম্রাটের ইচ্ছাক্রমে তার পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) ও কন্যা (মতান্তরে ভগিনী) যথাক্রমে মহেন্দ্র ও সংঘামিত্রা পবিত্র বোধিদ্রুমের চারা নিয়ে 'তাম-লিট্টা' বন্দ্রর হয়ে সিংহল বা আধুনিক শ্রীলংকায় গমন করেছিলেন।[৮] ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দন্ডী-র 'দশকুমারচরিতে' 'তামলিপ্ত'-কে 'সুহ্মে'র অন্তর্গত ('সুহ্মে দামলিপ্তাহ্বয়স্য নগরম্য') এবং এই বন্দরনগরীর নিকটবর্তী সমুদ্রে 'যবন' নাবিকদের 'বহিত্র' শ্রেণীর অর্ণবপোত পরিচালনার কথা বলা হয়েছে।[৯] বরাহমিহিরে'র 'বৃহৎ-সংহিতা'য় 'তাম্রলিপ্তি'কে শুধু একটি বিখ্যাত নগরী হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি,[১০] পরন্থ 'তাম্রলিপ্তকজনপদকে 'গৌড়ক' ও বর্ধমান থেকে আলাদা গণ্য করা হয়েছে।[১১] সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে' তাম্রলিপ্তিকে পূর্বসমুদ্রের অদূরে অবস্থিত বলা হয়েছে।[১২] এছাড়া শাস্ত্র ও কোষ গ্রন্থে যেমন 'বিষ্ণুপুরাণ' 'বায়ুপুরাণ, 'বিশ্বকোষ' বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাকর্মবিভঙ্গ' প্রভৃতিতে প্রাচীন বাংলার অন্যতম জনপদ ও বন্দর-নগরী হিসাবে 'তাম্রলিপ্তি'র উল্লেখ দেখা যায়।

বিভিন্ন নামে তাম্রলিপ্তি

তাম্রলিপ্তি হল তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিত্তি, তাম্রলিপ্তক, তামলিশ, তামোলিপ্ত, তামালিটেস, তমালিনি বিভিন্ন নামে উল্লেখ দেখা যায়।

ভৌগোলিক অবস্থান

তাম্রলিপ্তি সমতট হতে ৯০০ লি (আনুমানিক ১৫০ মাইল) এবং চিরকুট হতে ১৪০০ লি (আনুমানিক ২৩৩ মাইল) এর কিছু বেশি দূরে অবস্থিত ছিল। ধারনা করা হয় তাম্রলিপ্তি বঙ্গের মধ্যস্থল, উত্তর ও পূর্বাংশ এবং সমগ্র সু নিয়ে গঠিত ছিল। এর প্রধান অংশ ছিল বর্তমান ভারতের মেদিনীপুর জেলা এবং রাজধানী ছিল বর্তমান তমলুক।

পন্ডিতদের মতবাদ

তাম্রলিপ্তির ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিতদের মতবাদ সমূহ তুলে ধরা হল:

ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, "রাঢ়ার দক্ষিণে বর্তমান মেদিনীপুর অঞ্চলে তাম্রলিপ্তি দ-ভূমি দুইটি দেশ অবস্থিত ছিল"।[১৩]

ড. হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে, "The core of the territory lay in the modern Midnapore district and its capital has been identified with Tamalities of Ptolemy the modern Tamluk."[১৪]

According to Silva Levi, "Tamralipi was for centuries the greatest port of the Bay of Bengal ……Today , it is a market - town with some thousands of souls, called Tamluk on the Riparian, not for from its continence with the Hughli."[১৫]

ব্যবসা-বাণিজ্যের নগর হিসেবে তাম্রলিপ্তি

ব্যবসা-বানিজ্যের নগর হিসেবে এক সময় তাম্রলিপ্তির ব্যাপক জনশ্রুতি ছিল বলে জানা যায়। এ সময় তাম্রলিপ্ত মহাদেশে ব্যবসায়ী জনের প্রচুর লাভ হত। আর এর রাজধানী সমুদ্র তীর বা অতি নিকটে ছিল। যে কারনে ব্যবসা-বানিজ্যের সহজ ও সুন্দর পরিবেশ ছিল। কারন আগের দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটা নদী কেন্দ্রিক ছিল।

চীনা পরিব্রাজকদের দৃষ্টিতে তাম্রলিপ্তি

খ্রিস্টীয় ৫ম শতকের চৈনিক পরিব্রাজক 'ফা-হিয়েন' এর ভ্রমণবিবরণী-তে পাওয়া যায়: "Following the course of the Ganges, and descending eastwards for eighteen yojanas, he found on the sourthern bank the great kingdom of Champa, with topes reared at the place

where Buddha walked in meditation by his vihara, and where he and the three Buddhas, his predecessors, sat.There were monks residing at them all.Continuing his journey east for nearly fifty yojanas, he come to the country of Tamalipti (Ta-mo-li-ti), (the capital of which is) a seaport. In the country there are twenty two monasteries, at all of which there are monks residing. The Law of Buddha is also flourishing in it.Here Fa-hien stayed two years, writing out his surtrs, and drawing pictures of images."[১৬]

বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষার কেন্দ্র ও সমুদ্র-বন্দর হিসেবে 'তাম্রলিপ্তি'র এই খ্যাতি বলা যায় খ্রিস্টীয় ১২শ শতাব্দী নাগাদ কমবেশি অব্যাহত ছিল।[১৭] এর প্রমান ফা-হিয়েন পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনা। অবশ্য কেউ কেউ যেমন শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, খ্রিস্টাব্দ ৫ম শতক অবধি 'তাম্রলিপ্তি'র গৌরব বহাল ছিল। তাঁর ভাষায়, 'তাম্রলিপ্ত প্রাচ্য ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। বৌদ্ধযুগ হতে আরম্ভ করে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত, যখন ফা-হিয়েন ঐ বন্দর হতে সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন, তখন পর্যন্ত তাম্রলিপ্তির গৌরব অক্ষুণ্ন ছিল।

হিউয়েন সাঙ, ৭ম শতকের প্রথমভাগে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে এসেছিলেন। যতদূর জানা যায় তিনি ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুযারি থেকে ৩০শে মে পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে হিরণ্য-পর্বত থেকে চম্পা, চম্পা থেকে কাঁকজল বা কজঙ্গল, কজঙ্গল থেকে পৌন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন, পু-বর্ধন থেকে কামরূপ, কামরূপ থেকে সমতট, সমতট থেকে তাম্রলিপ্তি, তামলিপ্তি থেকে কর্ণসুবর্ণ, কর্ণসুবর্ণ থেকে ওড্র, সেখান থেকে গঞ্জাম ও কলিঙ্গ দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। ফলত এ থেকে প্রতীয়মান হবে যে হিউয়েন সাঙ, সমকালীন বাংলা, বিহার ও ওড়িশার প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ 'জনপদ' ঘুরেছিলেন।[১৮]

বসবাসকারী জনগোষ্ঠী

এ বন্দর নগরীর জনজীবনে বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি বহুধর্মের প্রভাব বজায় ছিল। কারন সে সময় সকল ধর্মের লোক মিলেমিশে বসবাস করত তা বোঝা যায়।

তাম্রলিপ্তির বিলীন

কালক্রমে গঙ্গার এ শাখা আরও পূর্বদিকে সরে গেলে তথা 'তাম্রলিপ্তি' বন্দর সংলগ্ন নদীখাত সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারনে নাব্যতা হারাতে থাকলে এযাবৎ যে বিরাট পশ্চাদভূমি স্থল নদী ও সমুদ্র পথে তাম্রলিপ্তিকে অনুকূল সহায়তা দিয়ে আসছিল, বাস্তবে সেটা কমে যায় ফলে দেশি-বিদেশি নৌপথ সমূহ বন্দরে সহজে ভিড়তে না পারায় এবং অন্যদিকে সমকালীন বাংলায় আর ও কয়েকটি নতুন নৌ ও সমুদ্র বন্দর যেমন আরব বণিকদের চাটগাঁও (চট্রগ্রাম) সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠা পাওয়ায় তাম্রলিপ্তির প্রয়োজনীয়তা কালের গর্ভে নিহিত হয়েছিল।

খনন

১৯৪০, ১৯৫৫ এবং ১৯৪৭ সালে এই শহরের বিভিন্ন স্থানে এবং সংলগ্ন এলাকায় খননও অনুসন্ধান চালনা করা হয়। এ খনন কার্যের ফলে নানা রকম বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ ঐতিহ্য

তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধ ঐতিহ্য সমূহের সংপ্তি বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

বিন্দুবাসিনী বিহার

তাম্রলিপ্তি শুধু সমুদ্র বন্দরই ছিল না, বরং বৌদ্ধ সভ্যতা সংস্কৃতির ও ছিল অন্যতম চর্চাকেন্দ্র বা পীঠস্থান। বৌদ্ধদের বিখ্যাত বিন্দুবাসিনী এ বিহার ছিল এখানে।[১৯] 'তাম্রলিপ্তি' জনপদে বৌদ্ধবিহারের সংখ্যা ক্রমান্নোয়নের একটি মূখ্য কারণ হতে পারে, 'This may have been due to a general deceline in the position of the Buddhists in this part Bengal and luck of to maintain and preserve the old monasteries.'[২০]

সংঘরাম

সমুদ্রতীরবর্তী 'তান-মো-লি-তি' (তাম্রলিপ্তি) রাজ্যের পরিবেষ্টিত ছিল ১৪০০ থেকে ১৫০০ 'লি'[২১] বা প্রায় ২৫০ মাইলের মতো[২২] এবং 'এই রাজ্যের ভূমি নিম্ন ও উর্বর; স্থানটি গ্রীষ্ম প্রধান, এখানে প্রচুর শস্য ও ফলমূল জন্মে, অধিবাসিগণ প্রিকারী, চঞ্চল, সাহসী ও পরিশ্রমী, রাজ্যের সংঘরামে প্রায় এক সহস্র আচার্য্য বর্তমান ছিলেন; পঞ্চাশটি হিন্দুদেব মন্দির ১০টি সংঘরাম বা বৌদ্ধ বিহার ছিল; তথায় নানা সম্প্রদায়ের আচার্য্য বাস করতেন; এখানে যথেষ্ট মনি-মুক্তা সংগৃহীত হত; যেকারনে লোক ছিল সমৃদ্ধশালী।

গৌরবময় বৌদ্ধযুগ

বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার কেন্দ্র ও সমুদ্র বন্দর হিসাবে তাম্রলিপ্তির এই খ্যাতি বলা যায় খ্রিষ্টীয় ১২শ শতাব্দী নাগাদ কমবেশি অব্যাহত ছিল। বৌদ্ধযুগ হতে আরম্ভ করে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত, যখন ফা-হিয়েন ঐ বন্দর হতে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন, তখন পর্যন্ত তাম্রলিপ্তির গৌরব অক্ষুন্ন ছিল।[২৩] এটা তাম্রলিপ্তির গৌরবময় বৌদ্ধযুগ ছিল।

বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র

তাম্রলিপ্তির অধিবাসীগণ প্রিকারী, চঞ্চল, সাহসী ও পরিশ্রমী রাজ্যের সংঘারামে প্রায় এক সহস্র আচার্য্য বর্তমান ছিলেন ; পঞ্চাশটি হিন্দুমন্দির ছিল তথায় নানা সম্প্রদায়ের আচার্য্য বাস করতেন। এ যুগে তাম্রলিপ্তি ছিল একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র।[২৪]

অশোক স্তূপ

তাম্রলিপ্তিতে অশোক স্তূপ বর্তমান ছিল। রাজধানীর নিকট আনুমানিক ২০০ ফুট উঁচু অশোক স্তূপ বর্তমান ছিল। স্তূপের নিকট চারজন বুদ্ধের অবস্থান ও ভ্রমনের চিহ্ন বর্তমান ছিল।[২৫]

বিখ্যাত ভারাহা বা বরাহ বৌদ্ধ মঠ

ইৎ-সিঙ 'তাম্রলিপ্তি' পরিভ্রমনে এসেছিলেন। সম্ভবত তখন সেখানে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার লোপ পেতে শুরু করেছিল, কেননা তিনি সেখানে মাত্র ৫টি ও ৬টি বৌদ্ধ মঠ দেখতে পেয়েছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল ভারাহ বা বরাহ।[২৬]

সর্বাস্তিবাদ বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা

তাম্রলিপ্তিতে সর্বাস্থিবাদ বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা প্রদান করা হত। সে সময় এ ধর্ম শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। Tao-lin নামক চীনা পরিব্রাজক তিন বছর এ ধর্ম শিক্ষা করেছিলেন বলে জানা যায়।[২৭]

তাম্রলিপ্তির প্রত্নকীর্তি

তাম্রলিপ্তিতে যে সকল প্রত্নকীর্তি পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

১. খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ-৫ম শতকের পদ্ম, চক্র, হস্তী, চৈত্য, সিংহ ও হরিণ চিহ্নিত কয়েকটি মুদ্রা;

২. মৌর্য যুগের পুরাণ নামের চারকোনা রৌপ্যমুদ্র;

৩. প্রথম কনিষ্কের তাম্রমুদ্রা;

৪. গুপ্তরাজ স্কন্ধগুপ্তের স্বর্নম্রদ্রা। মুদ্রাটির একপাশে যে রাজমহিষীর ছবি আঁকা আছে সেটিকে কেউ কেউ স্কন্দগুপ্তের পটমহিষী, আবার কেউ কেউ লক্ষ্মী মূর্তি বলে মনে করেন। এই নারী মূর্তির পাশে রাজমূর্তি আঁকা হয়েছে।

৫. ঢালাই করা ও ছাপযুক্ত প্রাচীনমুদ্রা;

৬. খ্রি. পূ. ১ম শতকের পোড়ামাটির যীমূর্তি;

৭. খ্রি.পূ. ২য় শতকের ছাচে তৈরি অপ্সরা পঞ্চচূড়া মূর্তি;

৮. মেষ শকটের মত পোড়ামাটির খেলনা;

৯. হাস্যরতা নারীমূর্তি। পোড়ামাটির তৈরী এই মূর্তির সাথে রোমান ও গ্রিক শিল্পকলার সাদৃশ্য আছে।

১০. প্রস্তরীভূত হাড় ও হরিণের শিঙে খোদিত শিল্প কর্ম;

১১. জাতক কাহিনী সমৃদ্ধ পোড়ামাটির ফলক;

১২. ব্রাহ্মীলিপি উৎকীর্ণ হাঁড়ি ও

১৩. ব্রোঞ্জের তৈরী দেবীমূর্তি।

১৪. পোড়ামাটির তৈরী ধূসর রঙের হাতির ভাঙ্গা অংশ। এতে হাতিতিকে শুঁড় উঁচিয়ে রাখতে দেখা যায়।

১৫. অমরাবতী ভাস্কর্য রীতিতে বেলে পাথরের তৈরী আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকের বুদ্ধ মস্তক।

১৬. রাজমূর্তি উৎকীর্ণ গ্রিক অরে রাজার নাম ও উপাধি লিখিত গুপ্তসম্রাট কুমারগুপ্তের সুবর্ণ মুদ্রা। রাজমূর্তির পাশে গমন দৃশ্য এবং উল্টোপাশে পদ্মসনা লক্ষীমূর্তি আঁকা আছে।

পরিসমাপ্তি

উপরি উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, তাম্রলিপ্তি রাজ্যটি বা জনপদটি মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এর চতুঃসীমা মোটামুটি এমন... উত্তরে বর্ধমান ও কালনা, পূর্বে গঙ্গা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে কলিঙ্গ রাজ্য।[২৮] তা প্রাচীন কামরূপের সীমানায় বা কাছাকাছি যে ছিল তা নিশ্চিত।[২৯] এখানে পরবর্তী উৎখননের ফলে নানা রকম বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও প্রত্নকীর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আর এ সকল উপাদান বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও প্রত্নকীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই বলা যায় তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধ ঐতিহ্যের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়।

তথ্যনির্দেশ ও টিকা

১. Buddhist Centres in Ancient Inida, দেখুন Perface.

২. Alexander Cunningham, The Ancient Geography of India, Low Price Publications, Delhi, 1990,p.421.

৩. ড.আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০০২, পৃ-৩৭।

৪. Dr.Prabodh Chandra Bagchi, (Translated from French) (orginal by Sylvain Levi, jean Przyluski & Jules Bloch), Pre-Ariyan and Pre-Dravidian in India, Asian Educational Services, India,1993, p-116.

৫. বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত, পৃ-৯- ১০।

৬. ড. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, কলকাতা, ১৪০০, পৃষ্ঠা ১২১।

৭. Edited by Dr.R.C.Majumdar, The History of Bengal, Dacca University,1963, Vol,I, p.22.

৮. কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, মধ্যযুগে বাংলা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃ-১৯৪; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ভারতকোষ, তৃতীয় খ-, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৬৮৪।

৯. Dandin, Dasakumara-Charita, Uchechhvasa VI.P.287.

১০. Dr. Amitabha Bhattacharyya in, Culture of Bengal Throught the ages: Some Aspects, Edited by Bhaskar Chattopadhyay, p.8.

১১. ড. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব, কলকাতা, ১৪০০, পৃষ্ঠা ১২১।
১২. Kathasaritsagara, III, 4,291.
১৩. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খ- (প্রাচীন যুগ), জেনারেল, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ-৯।
১৪. Edited by Dr.R.C.Majumdar, The History of Bengal, Dacca University,1963,Vol,I,p.22; ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খ- (প্রাচীন যুগ), জেনারেল, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ-৯৫।
১৫. Dr.Prabodh Chandra Bagchi, (Translated from French) (orginal by Sylvain Levi, jean Przyluski & Jules Bloch),Pre-Ariyan and Pre-Dravidian in India, Asian Educational Services, India, 1993,p-116.
১৬. A Record of Buddhistic Kingdoms, James Legge, Chapter XXXVII,p.100
১৭. ড. আবদুল হক চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বর্ণায়ন, ঢাকা, পৃ-৩৮।
১৮. Dr.Gaur Pada Sen, Culture of Bengal through the ages: Some Aspects, p.18.
১৯. Dr.B.C.Law, Introducing India, p.73.
২০. Niyogi, Dr.(Miss)Puspa, Buddhism in this part of Bengal, Jijnasa, Calcutta, 1980. p.11.
২১. চীন দেশীয় দূরত্ব পরিমাপক। ইংরেজী হিসাবে ১ মাইল-এর প্রায় ৬ ভাগের ১ ভাগ। বিস্তারিত, ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিষয়ক শব্দকোষ, কাবেদুল ইসলাম, পৃ-১৪৩)।
২২. Alexander Cunningham, The Ancient Geography of India,Low Price Publications,Delhi,1990,p.425.
২৩. ড.রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বাঙলা ও বাঙলী, রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা, ১৩৪৭, পৃ-৩৪।
২৪. A Record of the Buddhist Religion by I-tsing, Translated by J.Takakusu,p.xxxiii.
২৫. তথ্য সংগৃহীত, গৌড়ের ইতিহাস, পৃ-২৭।
২৬. A Record of the Buddhist Religion by I-tsing, Translated by J.Takakusu,p.xxxiv
২৭. Chavannes, Religieux Eminents, p.94.
২৮. Dr.Prodyot Kumar Maity, The Goddess Bargabhima:p.32-34.
২৯. Dr. Prabodh Chandra Bagchi, (Translated from French) (orginal by Sylvain Levi, jean Przyluski & Jules Bloch), Pre-Ariyan and Pre-Dravidian in India, Asian Educational Services, India,1993,p-119.

সাপ্রে বা দৈনাক্ টং-চং-য়্যা বিবরণ

- রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে উত্তর দক্ষিণ প্রলম্বিত ৫০৯৩ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট এক বিস্তীর্ণ পার্বত্যঞ্চলকে "পার্বত্য চট্টগ্রাম" বলা হয়। এই পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিলো গভীর অরণ্য, হিংস্র প্রাণীকুল এবং দুর্গম পাহাড়াঞ্চল। এখানে পাহাড়ীদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের আগমন, নির্গমন এবং অবস্থান অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত। এ সম্পর্কে ইংরেজরা কেন, আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী বাঙ্গালীরাও কিছুই জানতো না। এমনকি বর্তমানেও এ অঞ্চলের ইতিহাস সবার কাছে অনুদঘাটিত রয়ে গেছে। অতীতে উত্তর-পূর্ব ভারতের সমগ্র অঞ্চলটি 'কিরাট ভূমি' নামে পরিচিতি। পরবর্তীকালে আরাকান সীমানা পর্যন্ত 'কুকিল্যান্ড' হিসাবে পরিচিতি ছিলো। এর পর ইংরেজ শাসনকালে চট্টগ্রামের এই পার্বত্য জেলাকে 'কার্পাস মহল' বলা হতো।

ভারতের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্য ছিলো। এসব রাজ্যে পশ্চিমাঞ্চলের বিদেশীদের আগমন শুরু হয় ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগণের রাজ্যে সমূহের কোন সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার অস্তিত্ব না থাকায় তাদের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শত্রুতা বিরাজিত ছিলো। এই অনৈক্য আত্মকলহ এবং তাদের মধ্যে বংশ, গোত্র, উঁচু নিচু বর্ণের ভেদাভেদ থাকার কারণে ভারতের উপর বিদেশীর বিজয়কে সহজতর করে তোলে। ফলে বহু রাজা বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন আর ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এসব কারণে উত্তর পূর্ব ভারতের বসবাসরত মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী দক্ষিণ পূর্ব দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে শুরু করে।

এভাবে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা এক একটি মঙ্গোলীয় জন গোষ্ঠী দক্ষিন দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলে স্বাধীন জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে সাদেংগী ধার্মিক ও তার আলোকিত শক্তি ছিলো বলে গেংখূলীদের গীতের ভাষায় শোনা যায়। রাজা সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করে কালাবাঘা (বর্তমানে কুমিল্লা জেলা) রাজ্যের জালি পাগজ্যা (১) নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়।

সাদেংগীর মৃত্যুর বহু বছর পর এই বংশের বিচগ্রী নামে উত্তরসূরী রাজা চেৎ-তো-গৌং (চট্টগ্রাম) শাসন করেছিলেন বলে 'চট্টগ্রামের ইতিহাস (প্রাচীন আমল)- মাহবুব রহমান এর পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে। অনেকের মতে সাদেংগীর জ্যোষ্ঠ পুত্রের নাম বিচগ্রী (২) যাই হোক বয়প্রাপ্ত হবার সাথে সাথে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন কুমার বিচগ্রী। উক্ত সময়ে চট্টগ্রামের দক্ষীণাঞ্চল সহ রোয়াং (আরাকান) অবধি শাসন করতেন অক্সরাজা পার্শ্ববর্তী দেশের রাজাগনের কাছে অজানা ছিলোনা তার সৈন্য শক্তি ও পরাক্রমের কথা। এদিকে বিচগ্রী সৈন্য সংগ্রহ

করে কোন এক শুভ দিতে তিনি বেড়িয়ে পড়লেন অক্স রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে। সেনাপতি হিসাবে রাধামন ও জয়রাম দুই বিচক্ষণ যোদ্ধা। যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহুলোক হতাহতের পর অবশেষে অক্স রাজা পরাজিত হয়ে বার্মায় পলায়ন করেন।

যুদ্ধে বহু বৎসর অবতীর্ণ হবার পর বিচগ্রী তার পিতা- মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নি ও প্রতিবেশীর কথা মনে পড়ে প্রাণ কেঁদে ওঠে। তাই তিনি বিজয়ের আনন্দ উল্লাসে একদিন স্বদেশের দিকে রওয়ানা দিলেন। স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তনের আগে পথে শুনতে পেলেন তার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হয়েছে, ছোট ভাই উদগ্রী স্বঘোষিত রাজা হয়ে তাঁকে স্বদেশে ফেরার পথে বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই সংবাদ পেয়ে বিচগ্রী খুবই মর্মাহত হন এবং অনুজের দুরভিসন্ধি ও বিশ্বাস ঘাতকতায় তিনি স্বদেশে স্বজাতির মুখ দর্শন করতে না পেরে পুনঃ তাঁর অধিকৃত রোয়াং রাজ্যের অর্থাৎ আরাকানে ফিরে যান। ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে স্থায়ী বসবাস, রাজ্য শাসন ও বংশ রক্ষার জন্য সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন জাতীয় রমনী বিবাহ করেন। আবার অনেকেই স্বদেশে গিয়ে স্বজাতীয় রমনী বিবাহ করেন। এভাবে রোয়াং রাজ্যে এজাতির বসতি স্থাপন গড়ে উঠে।

রাজা বিচগ্রী অপুত্রক ছিলেন। সম্ভবতঃ সম্রাট অশোকের মতো কলিঙ্গ বিজয়ের যে রক্তপাত হয়েছিল তেমনি বিচগ্রীর শেষ জিবনে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন রক্তপাত দেখে এবং তার অনুসারীগণ, সবাই বৌদ্ধ ধর্মে পুরোপুরি দীক্ষিত হন। বিচগ্রীর মৃত্যুর পর বহু বছর পর্যন্ত আরাকানের কিছু অংশ তাদের অধীনে ছিলো। উত্থান পতনের মধ্যে পরবর্তীতে চাপ্রে নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। যাই হোক 'চাপ্রে' এই পরিব্যাপ্ত শব্দটি শত শত বছরের স্মৃতি এবং আরাকানি ইতিহাস গ্রন্থেও উজ্জল দৃষ্টান্ত। সা-প্রে অর্থ চাংমা রাজা। তবে চাপ্রে বা সাপ্রে বলতে শুধুমাত্র তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে বুঝায়। তঞ্চঙ্গ্যাদের ৭টি গছা বা গোত্রের মধ্যে দৈন্যাগছা গোছা মেলংগছার লোকদেরকে এখনও সবাই চাপ্রে নামে অভিহিত করে আসছে এবং নিজেরাও চাপ্রে কুল্যা বলে দাবী করে আসছে।

চাকমা ইতিহাস মতে ১৩৩৩-১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানে বার্মা শাসকের সাথে চাপ্রে জাতির রাজা অরুণ যুগে ভীষণ যুদ্ধ হয়। উক্ত সনে ১৩ ই মাঘ ১০,০০০ সৈন্য এংখ্যং ও ইয়াংখ্যং নামক এলাকায় বসবাস করেন এবং আরাকান রাজা তাদেরকে দৈনাক বা দৈংনাক অর্থাৎ অস্ত্রধারী যোদ্ধা নামে আখ্যায়িত করেন।

অক্সরাজার (বার্মার রাজাদেরকে বুঝায়) সাথে চাপ্রেদের একাধিকবার সংঘর্ষ হয়েছিলে বলে ধারণা করা হয়। বার্মারাজ মেঙ্গদির বিরুদ্ধেক যুদ্ধ করার জন্য চাপ্রেরাজ যে ফন্দি করেছিলেন তা লোক-প্রবাদ নিম্নরূপ ঃ-

চাপ্রেরাজের তুলনায় মেঙ্গদি রাজের শক্তি বহু বেশী। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন বন্ধুত্ব ভাব দেখানো ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই বন্ধুত্বভাব দেখিয়ে অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে চাপ্রে রাজ একটি চুনমাখঅ শ্বেত হস্তী মেংদিরাজকে উপহার পাঠালেন। এতে মেঙ্গদিরাজ খুবই সন্তুষ্ঠ হন। কিছুদিন পর হস্তীর শরীর প্রলোপ দেয়া চুনের সাদা আবরণ ঝরে যেতে শুরু করলো তখন মেঙ্গদিরাজ বুঝতে পারলেন এটা আসল নয়, নকল শ্বেত হস্তী। তিনি আর দেরী না করে চাপ্রেগণের উপর নির্যাতন শুরু করেন।

কথিত আছে, উক্ত সময়ে মেঙ্গদির লোকেরা খাজনা উশুল করার নামে চাপ্রেদের গ্রামে গিয়ে পুরুষদেরকে পিছ মোড়া বেঁধে গৃহের আঙ্গিনায় ফেলে সারারাত নির্যাতন করা হতো। আর স্ত্রীলোকদের দিয়ে মদ তৈরী করিয়ে সেই মদ পান করতঃ তাদেরকে যথেচ্ছো পাশবিক অত্যাচার চালাতো। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে গভীর অরণ্য পথে চাপ্রের অধিকাংশ লোক চট্টগ্রামের আলিকদম নামক স্থানে পালিয়ে আসেন। উক্ত সময়ে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা জামাল উদ্দীন অনুমতি ক্রমে ১২ খানি গ্রামের সমন্বয়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করেন। উক্ত ১২ খানি গ্রামকে বলা হয়েছিলো বারতালুক। এই বারটি গ্রামের ১২টি তালুক বা দলের নাম তাদের বৈশিষ্ট্য ও আচরণের উপর রাখা হয়। যথাঃ ১। দৈন্যা গছা ২। মোঃ গছা ৩। কারবুয়া গছা, ৪ মংলা গছা, ৫। ম্লেলং গছা, ৬। অঞ্যা গছা এবং অবশিষ্ট পাঁটি তালুক বা গছা উল্লেখিত গছার সাথে অর্ন্তভূক্ত হয়েছিল বা পরবর্তীতে চট্টগ্রামের পাবত্য অঞ্চলে চাকমা জাতিতে অন্তর্ভূক্ত হন কিংবা পুনরায় আরাকানে চলে যান বলে মনে হয়।

মেঙ্গদিরাজ চাপ্রে রাজার পরমা সুন্দরী কন্যা চমিখাকে বিবাহ করেন। চমিখার চৌজু, চৌপ্রু ও চৌতু নামে তিন জ্যোষ্ঠভ্রাতা ছিলো। তাদের মধ্যে চৌপ্রু শাসন করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে কখন কোথায় তা সঠিক জানা নেই। যাই হোক কনিষ্ঠ ভ্রাতা চৌতুর পুর ক্যাংঘরে মৈসাং (শ্রমণ) হন। যখন মেঙ্গদির অত্যাচারে স্বজন নিয়ে পালাতে শুরু করতে লাগলেন তখন মেসাংকে গোচরীভূত করা হয়েছিল ঃ-

যেই যেই বাপ ভাই যেই যেই যেই
চম্পক নগরত ফিরি যেই
এলে মৈসাং কেলেস নাই।।
ঘরত থেলে মগে পায়
ঝাড়ত গেলে বাঘে খায়
মগে নপেলে বাঘে পায়
বাঘে নপেলে মগে পায়।।

অতঃপর আকানে বসবাসরত দৈনাক নামেজাতির প্রাণের ভয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে আসেন। উক্ত সময়ে উত্তর চট্টগ্রামের স্বজাতীয় লোকের বসবাস ছিলো। তাদের মধ্যে দলপতি মোগলের অনুকুলে খাঁ উপাধি ধারণ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা শাসন করতেন। মোগলের অধীনে যে সব শাসনকর্তাকে রাজাও বলা হতো। যাই হোক আরাকান থেকে পালিয়ে আসার সময়ে অনেকেই লাল বা খয়ের বর্ণ এক টুকরা কাপড় খন্ড শরীরে পেচিয়ে মৈসাং অর্থাৎ বৌদ্ধ শ্রমণ সেজে ছদ্মবেশে ধারণ করেন এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন। কেননা অক্সানামে লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। সুতরাং লাল খয়েরী বর্ণের পোষাক ও মুণ্ডিত মস্তক দেখলে তারা আক্রমণ করতো না। আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে আসা ওসব মৈসাং বেশধারী অনেকেই অভাবে থেকে যায়। চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা তাদেরকে ডাকতো 'রোলী' (৩)। পরবর্তীতে এঁরা চাক্মা জাতীর একমাত্র ধর্মীয় পুরোহিত লাউরী নামে সমাদ্রত হন বলে মহাণ্ডিত কৃপাচরণ মহাস্থবির কর্তৃক সম্পাদিক ও কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'জগজ্যোতি' (১৯১৭) পত্রিকায় উল্লেখ রয়েছে।

চাকমা রাজন্যবর্গ ও তাদের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, রাজ বিচগ্রী থেকে শুরু করে সাত্তুয়া (পাগলারাজা) পর্যন্ত যেসব রাজা ছিলেন তারা 'রোয়াঙ্যা' চাংমা। আর ধাবানা থেকে বর্তমান সময়ে রাজা পর্যন্ত আনক্যাচাংমা নামে পরিচিতি। তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি লেখক শ্রী যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার মতে চন্দ্রঘোনার দক্ষিণ পূর্ব বা চট্টগ্রামের শঙ্খ নদীর দক্ষিণে রোয়াং বা আরাকান পর্যন্ত বসবাসকারীগণ টংসা' (আরাকানের ভাষায় টং অর্থ দক্ষিণ বা পাহাড়, সা অর্থ সন্তান বা পূর্বদিকে পাহাড়ী চাংমা। আবার চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের বসবাসরত আধিবাসদেরকে বলা হতো অনাক-সা'। অনাক্ অর্থ আরাকানীদের ভাষায় পশ্চিম । আনক-সা অর্থ পশ্চিম কুলের চাংমা। এব্যাপারে শ্রী অশোক কুমার দেওয়ান মহোদয়ের পুরোপুরি একমত রয়েছে তিনি মন্তব্য করেছিলেন চৌদ্ধ শতকের আগে আমাদের পূর্ব পুরুষদের পরিচয় ছিল ওভাবে । চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা পরিচয়ে নয়। তিনি ইহাও মন্তব্য করেন ধাবানা রাজা হয়ে চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের স্বজাতিদেরকে নিয়ে চাংমা জাতির সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে চামা (দক্ষিণ পূর্বাঞ্চাললে দৈনাক তংচঙ্গ্যাদেরকে ছাড়া) নামে স্বতন্ত করার প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

যতই অস্বীকার করি না কে, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। আমাদের পূর্ব পুরুষের আগমন, আচরণ ও অবস্থান আরাকানীরা হেঁয়ালিভাবে বলতে শুরু করেছিল। চাংমাং বা চামা এবং তংসা। পরবর্তীতে বিভক্ত শব্দ দুটির মধ্যে একটি চাংমা /চাকমা, অপরটি তংচাংয়া/তনচং/তঞ্চঙ্গ্যা রূপান্তরিত হয়। অনেকের দাবী মতে শাক্য থেকে চাকমা শব্দটি উৎপত্তি হয়েছিল। লুইনের মতে চেইং পেংগো অর্থাৎ চম্পক নগর

থেকে আগত বলেই নাম ধারণ করা হয়। বাবু সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকার মতে-এ বিশ্বাস বংশ পরম্পরায় চলে আসলে ও এধারণা কেবল মাত্র অনুমান-ত্রিপুরা জাতির রাজমালা পুস্তকের মতে অতীতে চাকমা সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই চাকমা পরিচয়ের শব্দটি এখনও রহস্যবৃত রয়ে গেছে। পঞ্চদশ শতক শেষে 'চাকমা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ত্রিপুরাদের প্রাচীন রাজমালা পুস্তক রাজমালা প্রথম লহড, ৩২ পৃষ্ঠা- কৈলাস চন্দ্র সিংহ।

ক্যাপ্টেন টিএইচ লুইনের ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর লিখিত মতে দেখা যায়, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে যেসব উপজাতি বসবাস করে তাদের নিম্নলিখিত নামে শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথাঃ-
১) "খ্যাংথা" বা নদীর সন্তান। এরা নদীর তীরবর্তী স্থানে বাস করে বলে খ্যাংথা নামে পরিচিত। তারা নিঃসন্দেহে আরকানী উদ্ভুত, প্রাচীন আরাকানী উপভাষায় কথা বলে এবং সর্বক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করে।
২) "টং থা" বা পাহাড়ের সন্তান। এরা মিশ্র জাতি উদ্ভুত এদের মাতৃভাষা বাংলা, তবে নানা ধরণের উপভাষায় কথা বলে। সন্দেহাতীত ভাবে খ্যংথাদের চাইতে অশিক্ষিত। এই শ্রেণির মধ্যে ত্রিপুরা, চাক, খ্যাং ও মারমা তাদের গোষ্ঠি অন্তর্গত। খ্যাংথা পাশাপাশি এরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণ করে। খ্যাংথা ও টংথা শব্দ দুটি আরাকানী ভাষার শব্দ। খ্যং অর্থ নদী অর্থ পাহাড় এবং "থা" বা সা (tsa) অর্থ সন্তান বা পুত্র। পাহাড়ী উপজাতিয়দের চিহ্নিত করার জন্য এই সব জাতি গত নাম কেবল আরাকানী উপভাষী উপজাতিরাই এভাবে ব্যবহার করে। অন্যান্য উপজাতিরা নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজেদের বা প্রতিবেশীদের পরিচয় দেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত পাহাড়ী উপজাতিয়দের বৃহত্তম অংশ নিঃসন্দেহে প্রায় দুই প্রজন্ম আরাকান থেকে এখানে আসে। চট্টগ্রাম কালেক্টরেটে রক্ষিত দলিল পত্রাদি ইতিহাস ঐতিহ্য একথা নিশ্চিন্তে বলা যায়। ১৮২৪ খ্রিঃ বার্মা যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ও সময় পর্যন্ত উপজাতীয় বহু শরণার্থী আরাকান থেকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে। উক্ত সময়ের আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রিপুরা, মগ, চাকমা তঞ্চঙ্গ্যা, খ্যাং, মুরুং, চাক, খুমি ছাড়া অন্য কোন জাতি ছিলো না।

তৈনচংয়্যা/তংচয্যা এই উচ্চারিত শব্দটি আরাকানে বা আলিকদমে বসবাসের সময় হতে শুরু হয়। প্রতীয়মান হয় যে, আরাকানে অবস্থানরত বহু চাপ্রে অর্থাৎ চাংমা নামের লোকেরা এককালে তৈনছড়ি কিংবা তৈগাঙ এলাকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তৈন সুরেশ্বরী নামে দক্ষিণাঞ্চলের রাজা ছিলেন। এই তৈন থেকে তৈনছড়ি নামের একটি নদীর নাম হয়েছিল বলে স্থানীয় প্রবীনদের মতামত রয়েছে। আবার ত্রিপুরা জাতির ভাষায় গাং, নদীকে তৈ বলা হয়। সুতরাং রাজা তৈন সুরেশ্বরী ত্রিপুরা ছিলেন। ত্রিপুরাদের মধ্যে

এখনো রোয়াংগ্যা ত্রিপুরা ও আনক ত্রিপুরা নামে শব্দটি প্রচলন রয়েছে। যাই হোক 'তৈ' হতে তৈনচংয্যা শব্দটি উৎপত্তি একথাও পরোপুরিভাবে ভুল নয়। কেননা ত্রিপুরা জাতির গাবিছা সম্প্রদায়ের মহিলাগণের পড়নের পিন্ধন ও বুক কাপড় সম্পূর্ণরূপে মিল রয়েছে। শ্রী মাধবচন্দ্র চাকমা রচিত " শ্রীশ্রী রাজনামা উৎপত্তি হয়েছিল- অশোক কুমার দেওয়ান) পুস্তিকায় আংশিক উদ্বৃত মতে জানা যায়, চাকমারা দুটি অংশে বিভক্ত। একটি রোয়াংগ্যা চাকমা ও অপরটি আনক্যা চাকমা।

তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা পূর্বে অভিন্ন সম্প্রদায় ছিলো। রাজা হিসাবে ধাবানা শাসনকালে 'চাকমা' নামে পৃথক একটি জাতির সংস্কার গড়ে তোলেন বলে উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে তার আগে তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা নামের শব্দটি কি নামে সম্বোধন ছিলো তা গবেষকগণ ব্যক্ত করতে পারেননি। আমাদের এ জাতিরা পূর্বে কথা-বার্তা, গঠন প্রণালী, পূজা অর্চনা, বিষু উৎসব, জন্ম, বিবাহের চুমলাং, পোষক পরিচ্ছেদ, সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি আসামের অহমীয়াদের প্রাচীন সংস্কারের সাথে অনেকাংশে মিল ছিলো একথা প্রমানিত করেছিলেন। তঞ্চঙ্গ্যাগণ শত শত বৎসর আরাকানে অতিবাহিত করেছিলেন এবং তথাকার কৃষ্টি সংস্কৃতি অনুসরণ ও অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের পূর্বে পুরুষের অতীত বৈশিষ্ট্যতা হারিয়ে ফেলেননি। বার্মা সরকার বর্তমান সময়ে তাদেরকে চাকমা জাতি স্বীকৃতি দিয়ে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে আসছে বলে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়।

মোগলের অধীনে চট্টগ্রামের উপর খন্ড খন্ড শাসন কর্তা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চাকমা রাজা নামে কথিত এমন শাসক হিসাবে যাঁরা পার্বত্য জাতির উপর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা সবাই ভাগ্যদেবতা বলা যায়। তাদের সাথে হৃদবন্ধনের ফলে অনুকম্পা লাভ করেন এবং খাঁ" পদবী ধারণ করে ইংরেজ আমল পর্যন্ত তাদের প্রভুত্ব বিকাশ পায়। যার কারণে ক্ষমতায়, সুযোগে, শিক্ষায় এমনকি দর্পেও বিস্তার পায়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পনের শতকের পর তঞ্চঙ্গ্যারা আলাদা ও পরিত্যক্ত জাতিরূপে বিবেচিত হয়। এরপর তাদের অভিযাত্রী জীবন প্রবাহ নিভে যেতে শুরু করে, এ জাতির ইতিহাস বিহিন করুণ আর্তনাদ নিরবে নিভৃত্বে মিলিয়ে যায় দূর বন পাহাড়ে।

আরাকানের ভুসিডং, রাচিডং, মংদু, ক্যকত, তানদুয়ে, মাগ্রাসহ আর কয়েকটি এলাকায় চাকমা নামের তঞ্চঙ্গ্যাদের গোষ্ঠী গোজার লোক প্রাচীন কাল থেকেই বসবাস করে আসছে। চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে কক্সবাজার জেলাধীন রামু, উখিয়া ও টেকনাফ থানায় এবং বান্দরবান জেলায় নাক্ষ্যংছড়ী ও আলিকদমে এখনো তঞ্চঙ্গ্যাদের পূর্ব পুরুষগণ বসবাস করে রয়েছেন। ইতিহাসের তথ্য মতে তারাই দ্বিগীজয়ী রাজা বিচগ্রী (বিজয়গ্রী), সেনাপতি রাধামণ, জয়রাম ও নিলংধন নামের উত্তরসুরি বংশধর বা যোদ্ধার বংশধর ছিলেন। যুদ্ধাভিযানে অগ্রসর হয়ে

তারা আরাকানে ও তার আশে পাশে বসবাস শুরু করেছিলেন। তঞ্চঙ্গ্যাদের আগমন চাকমা রাজা নামে খ্যাত ধরমবক্স খাঁ আমল পর্যন্ত বলবৎ ছিলো।

ধরমবক্স খাঁ ওসব আগমনকারীদেরকে স্বজাতি বলে গ্রহণ করার পেছনে উক্ত সময়ে কিছু কিছু প্রভাবশালীগণের কঠিন বাধা ছিলো বলে জানা যায়। আগমনকারীদের উপর যথেচ্ছা চুরি ডাকাতি ও জুলুম করা হয়েছিল বলে শোনা গিয়েছে। যার কারণে তারা দলবদ্ধভাবে রাইংখ্যং, কাপ্তাই, সুবলঙের উজানে, ঠেগা, শঙ্খ শেষ প্রান্তে, ত্রিপুরায়, লুসাই হিলে এমনকি পুনঃ মাতামুহূরী ও আরাকানে চলে যেতে বাধ্য হন। চাকমাগণ উক্ত সময়ে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে অভিহিত করতেন পরঙী অর্থাৎ বসবাসরে জন্য আগমণকারী।

ক্যাপ্টেন টি.এইচ.লুইন কর্তৃক লিখিত পুস্তক The Hill Tracts of Chittagong and Dwellers Therein (1869) মতে ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে এই জেলায় তঞ্চঙ্গ্যাদের জনসংখ্যা ছিলো ২৮০০ জন। এদের মধ্যে অনেক বয়স্ক ব্যক্তি আরাকানী ভাষায় কথা বলতে পারে কিন্তু নতুন প্রজন্ম বৃহৎ অংশের সাথে মিশে যাচ্ছে আর এক বিকৃত ধরণের বাংলা ভাষা তাদের যোগাযোগের মাধ্যমে হিসাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। এরা কিন্তু সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, ধর্মচ্যুৎ হয়নি, তবে প্রকৃতি পূজারী এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে। তিনি আরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের দিকে চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁ আমলে ৪,০০০ জন তঞ্চঙ্গ্যা পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমণ করেন। এদলের রাজা ছিলেন ফাপ্রু। স্থায়ী বসবাসের জন্য তিনি তার দলের প্রত্যেকের কাছে চাঁদা উঠিয়ে পর্তুগীজদের নির্মিত চট্টগ্রামের 'লাল কুঠির' ক্রয় করে ধরমবক্স খাঁকে উপহার দিয়েছিলেন বলে এখনও কথিত রয়েছে।

আরাকানের ভুসিডং এলাকা থেকে আগত ধল্যা চাকমা (৪) অভিমত ব্যক্ত করেন, চাকমা রাজা হিসাবে ধরমবক্স খাঁন যখন রাজা হলেন এই সংবাদে খুশি হয়ে সংথাইং আমু নামে জনৈক বিত্তশালী ও দলের নেতা হিসাবে আরাকান থেকে চট্টগ্রামে আগমণ করেন এবং স্থায়ী বসবাসের জন্য রাজা ধরমবক্স খাঁনের সাথে সাক্ষাতের আবেদন জানান। কিন্তু ধরমবক্স খাঁন তার আবেদন প্রত্যাখান করেন। নিজের ব্যক্তিত্ব ক্ষুন্ন হবার মনোভাবে তিনি আর দেরী না করে পুনঃ আরাকানের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন। যাত্রার সময় বীরবেশে সিঙাল (গয়ালের কিংবা মহিয়ের শিং এর ধ্বণি) ও ঢোলক বাজিয়ে এ অঞ্চল ত্যাগ করেছিলেন বলে কথিত আছে।

একই ভাবে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির নেতা শ্রীধন আমুর নেতৃত্বে ৩০০শত তঞ্চঙ্গ্যা পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমণ করেন। রাজা ধরমবক্স খাঁকে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য উপঢৌকন দিয়ে বসবাসের সম্মতি লাভ করেন। পরঙী নামে এই তিনশত পরিবার সবাই সচ্ছল ছিলেন এবং তারা রাইংখ্যাং নদীর তীরবর্তীতে পুনঃবসতি স্থাপন করেছিলেন। স্বচ্ছলতার কারণে তাদের উপর বার বার ডাকাতি লুটপাট করা হতো বলে বুড়া-বুড়িদের মুখে শোনা গিয়েছে।

চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁর আমলে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে কিছু লোক অন্যত্র চলে যাবার পেছনে আরও একটি ঘটনা রয়েছে। অগ্রহায়ন মাসের কোন একদিন তঞ্চঙ্গ্যাদের ধৈন্যা গছা আর কারবুয়গছার লাপস্যা দলের মধ্যে উয়্যাপে নামে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তুমুল সংঘর্ষ বাধে। ফলে উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হয় এবং রাজ দরবারে বিচারের সম্মুখীন হন। এই ঘটনার পর অনেকেই অন্যত্র চলে যান। তাদের মধ্যে গছা ভিত্তিক দ্বন্দের জন্য বিবাহ সাদি বন্ধ হয়ে যায়

তঞ্চঙ্গ্যারা আরাকান অধিবাসী, আরাকান থেকে চট্টগ্রামে এসেছিলো একথা পুরোপুরি সত্য নয়। তারা চট্টগ্রাম থেকে আরাকানের দিকে কিছু অংশ চলে গিয়ে দৈনাক সম্বোধিত হন। অন্যদিকে চট্টগ্রামে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বদিকে অধিকাংশ স্থানে তাদের স্বাধীনভাবে বসবাস ছিলো। অন্যান্য উপজাতীয়দের মতো নিজস্ব আইন শাসনের মধ্যে গভীর বনাঞ্চলে জুম চাষই ছিলো তাদের একমাত্র ভরসা। তাই তঞ্চঙ্গ্যাগণ মোগলধর্মী রাজার কিছু কিছু সামাজিক আইন মানতে রাজী ছিলোনা। যেমনঃ ক) কোন তঞ্চঙ্গ্যা রমনীর মৃত্যু হলে তাকে পশ্চিম দিকে মাথা রেখে পুড়িয়ে ফেলা, খ) লুরী বা লাউরী নামের ধর্মগুরু দিয়ে অন্তোষ্টিক্রিয়া কিংবা সামাজিক কর্মাদি করা, গ) মহিলাগণের এককানে পাচটি করে দুই কানে দশটি ছিদ্র করা, পড়নের পিনুইনে চাবুগী রাখার পার্থক্য ইত্যাদি। সম্ভবতঃ ওসব সামাজিক কিছু কিছু নিয়ম লজ্ঞন করেছিলো বলে চাকমারাজা উক্ত সময়ে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে স্বজাতি বলে স্বীকৃতি না দেয়ার অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে।

আরাকানে অবস্থানরত চাকমাগণ (তঞ্চঙ্গ্যাগণ) শাক্যবংশের উত্তরসূরী হিসাবে তদানিন্তন জেনারেল উনু প্রতিবছর এ জাতির দম্পতি রেঙ্গুনে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্বর্ধনা দিতেন। বর্তমান সময়েও আদিবাসী জাতি হিসাবে সরকার তাদেরকে প্রতি বছর আমন্ত্রণ জানিয়ে রেঙ্গুনে শাক্যজাতির সম্মানে সম্বর্ধনা দিয়ে আসছে বলে জানা যায়। ধল্যা চাংমা বলেন, আরাকানে অবস্থানরত চাকমা নামে পরিচিতি মুগছা, ধৈন্যাগছা, কারবুয়াগছা, লাংগছা, মগলাগছা এবং অঙ্যগছা ছাড়া কোন চাকমা গছা নেই। ১৯৮৫ সনে লোকগণনায় দেখা গিয়েছিরো আরাকানে ৯২,৩০০ জন চাকমা (তঞ্চঙ্গ্যা) রয়েছে। ইহা ছাড়া ত্রিশ হাজারের মতো বার্মায় বসবাসের ফলে বর্তমানে তারা বার্মীজ সম্প্রদায়ের সাথে মিশে যান। তাদের মধ্যে বুড়াবুড়িরা কিছু কিছু তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় কথা বলতে পারে, ভুসিডং নিবাসী ধল্যা একথা বলেন।
চাকমারাজা ধরমবক্স খাঁ খুবই প্রতিপত্তি সম্পন্ন রাজা ছিলেন। তাঁর শাসনের পরবর্তী কালের রাজাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের তঞ্চঙ্গ্যাগণের উপর অভিন্নতা মনোভাব ও সদাচারণ এমন কি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেননি বলে জানা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের যখন মৌজা নির্ধারণ ও বন্টন করা হয় তখন পাঁচ জন তঞ্চঙ্গ্যাকে মৌজার হেডম্যান পদ দেওয়া হয়েছিল।

নিরহংকার, অসাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী রাজা ভূবন মোহন রায় শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে শ্রী পলমাধন তঞ্চঙ্গ্যাকে 'রাজকবি' এবং শ্রেষ্ঠ উবাগীতের ধারক বাহক শ্রীজয় চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (কানা গিংখুলী) কে 'রাজাগীংখুলী' উপাধিতে ভূষিত করে প্রতি বছর রাজপূণ্যাহের উপলক্ষে রাজসভায় যোগ্যতার আসনে উপবিস্থ করে রাখতেন। তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ওসময় শেষ্ঠ ব্যক্তি শ্রী কুঞ্জ মহাজন ও শ্রী খোক্কেয়া বৈদ্যের সাথে রাজা ভূবন মোহন রায় গভীর সম্পর্ক ছিলো বলে জানা যায়। রাজকুমার নলিনাক্ষ রায় স্বজাতির মেয়ে বিবাহ না করে জটিলা দেবী নামে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির রমনীকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আংটি পরিয়ে দেন। এব্যাপারে পাত্র মিত্র ও অন্যান্য স্বজনদের সাথে রাজা পরামর্শ করেন। কিন্তু তঞ্চঙ্গ্যাদের সাথে চাকমাগণের বৈবাহিক সম্পর্ক অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বিধায় রাজবংশের মান সম্রম বিষয়েও বিবেচনা করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়ে যায়। নলিনাক্ষ রায়ের পর কুমার ত্রিদিব রায় রাজা হয়ে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ভিক্ষু শ্রীমৎ অগ্রবংশ স্থবিরকে 'রাজগুরু' পদে অধিষ্ঠিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্ম উদিত হয় এবং ধর্ম বিস্তারে অকল্পিত স্বাক্ষর বহন করে।

(তঞ্চঙ্গ্যা জাতি, রকিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা, চট্টগ্রাম, ২০০০।)

টীকা ঃ-

১) জালিপাগজ্যা একটি বট জাতীয় বৃক্ষের নাম। এই বৃক্ষের পাকাবীজ পাখিরা খেয়ে অন্য একটি বড় গাছের উপর পায়খানা করে এবং সুবিধা মতো হলে সেখানে চানা রূপে জন্ম হয়। এই চারার শিকড় ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে জলের মতো সমস্ত গাছকে পেচিয়ে নিজে বৃদ্ধি পায় এবং বিশাল জালিপাগজ্যা রূপে শোভা বর্দ্ধন করেন।

২) গবেষকদের মতে বিচগ্রী, উদগ্রী নামে তিন ভাই। চাকমাদের ভাষায় বিজয়গিরি, উদয়গিরি ও সমরগিরি। আবার ত্রিপুরাদের রাজমালা ইতিহাসের মতে দেখা যায়, বিজয় মাণিক্য, উদয়মানিক্য ও অমর মাণিক্য নামের ত্রিপুরা রাজা ছিলেন। ত্রিপুরার জাতির সেনাপতির নাম, কালানজির, রণগণ ও নারায়ণের সঙ্গে আমাদের সোনপতি কালাবাগা, রাধামণ ও জয়রামের অদ্ভুদ মিল দেখা যায়।

৩) বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মে মহাস্থবিরের অবদান পুস্তকের মতে রাউলী শব্দটি এসেছে আউলিয়া থেকে। মুসলমানরা তাদের ধর্ম প্রচারকগণকে আউলিয়া সম্ভোধন করতেন।

৪) ধল্যা চাকমা (তঞ্চঙ্গ্যা) ৩রা জানুয়ারী ১৯৯৯ ইং রাঙ্গামাটি আসেন। বাড়ী আরাকানের ভুসিডং ইউনিয়নের মিজং গং চো এ। বয়স ৫৫ বৎসর। ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ে সুপণ্ডিত। বার্মা ভাষায় শিক্ষিত। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা বিষয়ে গবেষণার জন্য রাঙ্গামাটিতে আসেন। ধল্যার মতে আরাকানে তাদের বসবাস প্রায় ৭ শত বৎসর। রাঙ্গামাটিতে এসে চাকমাদের পোষাক, চেহারা, আচরণ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন।

লেখকের অনুমতিক্রমে ভারতে মাধব মাস্টার আদাম, মুনগাঙ, তিবুরা, "বিঝু নিজেহ্‌" নামক প্রকাশনা থেকে সংগৃহীত।

লেখক ঃ বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক, অধ্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠাতা, রাঙ্গামাটি চারুকলা একাডেমী।

তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসী জনগোষ্ঠী

মিলন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা-প্রভাষক

তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় পার্বত্য এলাকার অন্যতম আদিবাসী জনগোষ্ঠী। এরা মঙ্গোলীয় এবং তিব্বতের বর্মন ভাষাভাষী নৃগোষ্ঠী হলেও এদের ভাষা ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্ভূক্ত। ভারত, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার এই তিন দেশের পার্বত্য এলাকায় এদের বসবাস। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও রাঙ্গুনীয়া উপজেলার উত্তর-পূর্বাংশ এবং কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে তঞ্চঙ্গ্যাদের বসতি রয়েছে। মিয়ানমারের আকিয়াবের সিত্তুয়ে জাম পুইহিলের দক্ষিণে কলদান নদীমুখ এলাকায় এদের বসতি ছিল। জনশ্রুতি আছে, তঞ্চঙ্গ্যারা পূর্বেকার পরিচয় দাইনাক নামে মিয়ানমার বা আরাকান থেকে এসেছিল। মিয়ানমারের রাখঅইন ইতিহাসের আলোকে ধারনা পাওয়া যায়, দাইনাকদের উৎপত্তি ঘটেছে মিয়ানমার ভূখন্ডে আরাকানে অবস্থিত প্রাচীন দান্যাওয়াদিতে। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা মনে করে তারা দাইনাক নামে অভিহিত হয়েছেন। প্রাচীন দান্যাওয়াদির সেই অধিবাসী দাইনাকদের একটি অংশ কোনো এক সময় আরাকান থেকে পার্শ্ববর্তী নাফ নদী অতিক্রম করে সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে মিয়ানমার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাস শুরু করে।

পনের শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রায় দেড়শ বছর চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অর্ন্তগত ছিল। এছাড়া এ অঞ্চলে এসে মাতামুহুরী নদীর তৈনগাঙ (মারমারা বলে তৈনছং) এ সর্বপ্রথম বসতি গড়ে তোলে। কালের পরিক্রমায় সেখান থেকে পশ্চিম ও উত্তর দিকে ছড়িয়ে পড়ে বসতি গড়লে লোকজন ওদেরকে তৈনছঙের অধিবাসী বা তৈনছংগ্রা (তঞ্চঙ্গ্যা) নামে ডাকতে শুরু করে। এভাবেই ওরা তঞ্চঙ্গ্যা নামে পরিচিতি পায়। তবে মারমা, রাখাইন ও মিয়ানমারের লোকজনের অনেকেই এখনো তাদের দাইনাক নামেই ডাকে।

তঞ্চঙ্গ্যারা ১২টি গোত্র বা গছায় বিভক্ত। প্রাচীনকাল থেকেই ওরা জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। তাই জুম ছিল তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি। এরা এখন শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মালম্বী তঞ্চঙ্গ্যারা প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে বৈশাখী পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমাসহ আরও অনেক ধর্মীয় পার্বণ পালন করে। সামাজিক উৎসব হিসেবে বিষু উৎসব, নবান্ন, আলপালনী ইত্যাদি উৎসব পালন করে। তঞ্চঙ্গ্যা জাতি সত্তার নিজস্ব ভাষা আছে। জার্মান পণ্ডিত ভাষা তাত্বিক ড.জি এ গিয়ারসন ১৯০৩ সালে প্রকাশিত 'লেঙ্গুয়েস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' নামক গ্রন্থে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে উভয় ভাষাকেই আর্য-হিন্দু বা ইন্দো-এ্যারিবিয়ান ভাষা হিসেবে উল্লেখ করেন। তঞ্চঙ্গ্যারা ইন্দো-আর্য শাখার পৃথক ভাষায় কথা বলে যা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সাথে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও ঐ ভাষায় তিবেতো-বর্মন কিছু বৈশিস্ট্য রয়েছে। ওদের নিজস্ব লিপি রয়েছে। ঐ লিপি অনেকটা বার্মিজ লিপির মত। বর্তমানে দাইনাক বর্ণমালাই হল তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা।

এই জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ লোক-সংস্কৃতি রয়েছে। উভাগীত বা সাপ্লেগীত হল তাদের নিজস্ব গান। সাপ্লে নামক তাদের আবাস প্রাচীন আবাস ভূমির স্মরণে ওরা গীত বা গান গায়। উবাগীত বা পালা গান সাধারণত প্রেমের গান হয়ে থাকে। উভাগীতের সুরে নারীরা খেংগ্রং নামক বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি মাউথ অর্গান বাজায়। আর পুরুষরা বাজায় বাঁশের বাঁশি। ওরা গীঙুলী বা গেঙ্গুলীরা বেহালা বাজিয়ে উভা গীত বা পালা গান গায়। ওরা প্রাচীনকাল থেকে মন্দিরনৃত্য পরিবেশন করত। এখন ওরা জুম নৃত্যসহ দৈনন্দিন জীবনের নান্দনিক ঘটনা তুলে ধরে চমৎকার নৃত্য পরিবেশন করেন। এখনও নাটক-সাহিত্যে তঞ্চঙ্গ্যারা অবদান রাখছেন।

তঞ্চঙ্গ্যাদের পোশাকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নারীদের পরিধেয় পোশাককে ওরা পিনুইন বা পেনুইন বলে। দেখতে রঙধনুর মত এটি দৈর্ঘ্যে ৪ হাত। ওদের বিভিন্ন গছার নারীদের পোশাকের অনুসঙ্গ হিসেবে মাথায় খবং (পাগড়ি), ফারদ্দরী (কোমরবন্ধনী), ব্লাউস বা কোবই সালুম ভিন্ন ডিজাইনের হলেও পিনুইন ও খাদি সকল গছার নারীদের একই ডিজাইনের হয়ে থাকে। তঞ্চঙ্গ্যা নারীদের পোশাক হল পিনুইন, সালুম, মাদা-হাবঙ, পাদুরী ও খাদি। তঞ্চঙ্গ্যা পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হল সাদাজামা-সাদাধুতি। কিন্তু বর্তমানে পুরুষরা তাদের পছন্দ মত প্যান্ট, শার্ট, লুঙ্গি পরিধান করে। নারীরা রূপা ও স্বর্ণের অলংকার ব্যবহার করে। নারীরা পায়ে, হাতের বাহু, গলা, কানে ও চুলের খোঁপায় অলংকার ব্যবহার করে। পায়ে রূপার তৈরী খাড়ু পরে। ওরা কনুই বা হাতে রূপা বা স্বর্ণের খাড়ু, বাঘোর, কিঞ্চিক, বাঙড়ী বা চুড়ি ব্যবহার করে। এছাড়া গলায় রূপার চেইনসহ চন্দ্রহার, সিকি ছড়াযুক্ত হাঁচুলি, রূপারমালা এবং চুলের খোঁপায় রূপার তৈরি চুলের কাটা ব্যবহার করে।

এতদঞ্চলে তঞ্চঙ্গ্যাদের আগমন ও বিকাশের ইতিবৃত্ত যাই হোক না কেন সুদীর্ঘকাল নিজেদের স্বতন্ত্র অনুভূতিতে ক্রমে ক্রমে তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতির জন্ম লাভ ঘটেছে যা এতদঞ্চলের অপরাপর জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি থেকে সহজেই আলাদা মনে হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর তঞ্চঙ্গ্যা শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক স্তর হতে নিজস্ব মাতৃভাষায় ও বর্ণমালায় শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি হলে তাদের বিদ্যালয় ঝড়ে পড়ার হার কমে যাবে। ফলে তাদের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা ক্ষেত্রে কাংখিত অগ্রগতি বা উন্নয়ন সাধিত হবে। বাংলাদেশে সকল আদিবাসী শিশুদের নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক পর্যায় হতে শিক্ষা অর্জনের অধিকার থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় তৎজন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের নিকট সুদৃষ্টি কামনা করছি।

লেখক :
মি. মিলনকান্তি তঞ্চঙ্গ্যা-প্রভাষক
যুগ্ম আহ্বায়ক, তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটি ও
সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি,
বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা।

তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস প্রসঙ্গে

- সত্য বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা।

তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর অতীত সম্পর্কে জানার আগ্রহ অনেক দিনের। তাই বিষয়টির উপর কিছু পড়াশুনা করার পর্যায়ে আমার চিন্তায় যে ক'টি প্রশ্ন এসে ভিড় করেছে সেগুলো নিয়ে মত বিনিময়ের মানসে এ লেখার মাধ্যমে পাঠকদের নিকট উপস্থাপন করছি।

প্রথমতঃ - অধিকাংশ ইতিহাসের বইয়ে মূলতঃ বিভিন্ন রাজবংশের বিবরন এবং বিভিন্ন রাজ-রাজড়ার কীর্ত্তি কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। রাজ্যাভিযান এবং যুদ্ধবিগ্রহের ডামাঢোলে সাধারন জনগোষ্ঠীর ইতিহাস চিরকালই চাপা থেকে গেছে।

দ্বিতীয়তঃ - বিশেষ করে যে সময়ের কোন লিখিত দলিল অথবা নিদর্শন পাওয়া যায় নি সে সময়ের বিবরন লেখকগণ মূলতঃ জনশ্রুতি অথবা অনুমানের উপর নির্ভর করে লিখে গেছেন। যে কারনে বিতর্কের জন্ম।

তৃতীয়তঃ - ইতিহাস লেখকগণের দৃষ্টিভঙ্গী ও তথ্য-উপকরণ প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতাও ভিন্ন ভিন্ন।

২০১৬ ইং সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়ন্ত সেন তঞ্চঙ্গ্যা সম্পাদিত 'পহ্‌র জাঙাল' ১১ সংখ্যা তে উপরোক্ত বিষয় নিয়ে আমার একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তা'তে আমি মূলত: তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠির অনুমিত অতীত ইতিহাস পর্যালোচনাতে বেশী সময় নিয়েছিলাম। হাজার বছর থেকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ কোথায়, কীভাবে, কী পরিবেশে, কীরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বংশ পরম্পরা জীবন অতিবাহিত করে আসছিলেন তা'র কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিবরণ আমাদের জানা নেই। তবে অর্ধশতাব্দী পূর্বেও তঞ্চঙ্গ্যা সাধারনের সামাজিক কাঠামো, সামাজিক আচার-নীতি, জীবিকা-নির্বাহের ধরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে আমরা যা' জানি তা' থেকে আমরা আরও কয়েকশ' বছর, এমন কি, হাজার বছরের জীবন সম্পর্কেও যুক্তিনির্ভর কিছু অনুমান করে নিতে পারি। কারন, বিগত সাত বছর আগেও বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য মূলত: লিখিত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং জনশ্রুতি, লোককাহিনী, কিংবদন্তী ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে হতো এবং এটি অনেক শ্রমসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল, কিন্তু বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুব সহজে এবং অতি অল্প সময়ে বিষয়-সম্পর্কিত আরো অনেক বেশী ও বিস্তারিত ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত পাওয়া সম্ভব। বিশেষ করে জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক পরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ে তাদের সম্ভাব্য আবাসভূমিগুলোতে তদ্‌কালীন রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন খ্যাতনামা গবেষকের তথ্যসমৃদ্ধ লেখা ও বিবরণ বর্তমানে অনলাইনে সংগ্রহ করা যায়।

ইতিহাসের সূত্র থেকে আমরা জেনেছি, তঞ্চঙ্গ্যাদের পূর্বপুরুষগণ ১৮১৯ ইং সালের পূর্বে আরাকানে ছিলেন। আরাকানের কোন অঞ্চলে তাদের বসতি ছিল জানতে হলে 'দাইনাক' জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ টানতে হয়।

দাইনাক (Daingnet) নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নিম্নে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা উল্লেখ করছি।

["দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদফুং" পুঁথি'র সূত্রে) চাকমা জাতি- সতীশ চন্দ্র ঘোষ (অন লাইন সংস্করন) পৃ:-২২-২৫] থেকে-

"৬৯৫ মঘাব্দে (১৩৩৩-৩৪ খ্রি: অ:) আরকানাধিপতি মেঙ্গদি সমীপে লামনছুগ্রী নামা জনৈক দূত আসিয়া সংবাদ দিলেন, উচ্চব্রহ্মের চাকমা রাজা নানা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। . . . . অতি সহজেই চাকমা রাজা ইয়ংজ মধ্যমপুত্র চোফ্রু ও কনিষ্ঠ পুত্র চৌতুকে বন্দী করিয়া . . . . অবরোধ করেন। . . . . চাকমা রাজ ইয়ংজকে আরাকানের অন্ত:পাতী কামুছা নামক স্থানে কাফ্যাজাতির আধিপত্য অর্পন করেন। . . . . . অপর দশ সহস্র চাকমা প্রজাকে আরাকানের অন্তর্গত এংখ্যং এবং ইয়ংখ্যং নাসক স্থানে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্বতন উপাধি পরিবর্তিত করিয়া 'দৈনাক' আখ্যা দেয়া হইল।

অন লাইনে প্রাপ্ত সূত্র থেকে-

The Shan kings of Panya invaded the country some fifty years later, according to the Arakanese accounts; but in 1333 the king of Arakan carried off Min Shin Saw, the Governor of Thayetmyo . He released him about ten years later. During this period Arakan was in the utmost disorder, and usurpations were frequent. In 1373 the Arakanese are said to have asked Mingyi Swa Sawkfe, king of Burma, to nominate a king for Arakan, and he selected his uncle, Sawmungyi. The latter was soon driven out, however, and the country again fell into the greatest confusion. (w.w.w.global security org/ . . / history of Arakan. htm)

In 1333-34 CE Arakan king defeated the (Thek) Sakyan king at Micchagiri (present Thayet, Magwe, Myanmar) and took them to Arakan, Western Myanmar and our Sakyan (Thek) become Dainak (Myanmar Min Aredawbung, Danyawaddy Aredaw Bung: 14)

https://tongnexusglobe.wordpress.com

In 64-1 A.E. (1279 A.D.) Mengdi, the seven-year son of Menghhiloo", was placed on the throne. His reign in his mature years was marked by peace and prosperity. However, it also witnessed the aggressions of the Shans", the Burmese and the Theks. (Shodganga inflibnet)

অপর দিকে আরাকানের রাজবংশ তালিকায় দেখা যায়- ১২৭৯ থেকে ১৩৭৩ খ্রি: অ: পর্যন্ত Launggyet এ আরাকানের রাজা ছিলেন Min Hti. এবং উচ্চব্রহ্মে Myinsaing এর আধা-সানবংশীয় রাজা ছিলেন Yazathingyan (1310-12/13)। আর Uzana ১ নামে ১৩২৫ থেকে ১৩৪০ খ্রি:অ: পর্যন্ত Pinya তে একজন শানবংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায়।

Mr. Hodgson (Journal Bengal Asiatic Societys, No. I. of 1853) states his opinion that the Thek (Chukma) of Arracan are of aboriginal descent.

উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে ধরে নেয়া যায়- "দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদফুং" পুঁথি বা গ্রন্থ সূত্রে কথিত ১৩৩৩-৩৪ খ্রি: অ: এ আরকানাধিপতি মেঙ্গদি এবং ১২৭৯ থেকে ১৩৭৩ খ্রি: অ: পর্যন্ত Launggyet এ আরাকানের রাজা Min Hti. একই ব্যক্তি। কিন্তু কথিত উচ্চব্রহ্মের চাকমা রাজা ইয়ংজ এবং Myinsaing এর আধা-সানবংশীয় রাজা Yazathingyan (1310-12/13) ও Pinya এর শানবংশীয় রাজা Uzana 1 কে একই ব্যক্তিরূপে গণ্য করলে ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি ঘটে। কারণ, The Shan Avi the Thek এক নয়। একইভাবে Min Shin Saw, the Governor of Thayetmyo কে চাকমা রাজা ইয়ংজ মনে করা যায় কি না তা' পাঠকগণ বিবেচনা করবেন।

চাকমা জাতি- সতীশ চন্দ্র ঘোষ (অন লাইন সংস্করন) পৃ:-২৫ থেকে- ইহার পরবর্তী বিবরন উল্লেখ্য-

"চুইজুং-ক্য-থাং" এ ব্রহ্মদেশে চাকমারাজ্যখন্ডের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার কোন সীমা নির্দ্দেশ নাই। মইচাগিরিই বোধ হয় সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল। মুইচাগিরি বিজয়ের পর আরাকানাধীশ্বর চাকমারাজ্য বিধ্বস্থ করিয়া ফেলেন। অত:পর তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। বলিতে কি, আর উঠিতেই পারিলেন না। . . . . চাক্‌মারাজ ইয়াংজকে অপর এক স্বতন্ত্রজাতিরই আধিপত্য দেওয়া হইয়াছিল। এবং রাজপূত্রগণের মধ্যে চোফ্রু এবং চৌতু বিজাতীয় রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। সুতরাং কেবল যুবরাজ চতুর হস্তেই দলিতাবশেষ চাকমাদিগের আধিপত্য ছিল ; অর্থাৎ মংজাম্রু তখন একমাত্র চাকমা রাজ্য। অন্যপক্ষে, এই বিপ্লবে চাকমাজাতি হইতে দশসহস্র লোক দৈনাকনামে অপর এক শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। তাহারা সময়ে নিকটবর্ত্তী জাতিসমূহের সাথে বিবাহসম্বন্ধও চালাইয়া থাকিবে। কিন্তু কালক্রমে চাকমাদিগের এই অবশিষ্ট রাজ্যও রহিল না।

'চাকমা জাতি' গ্রন্থের লেখক সতীশ চন্দ্র ঘোষ চতুর্দশ শতাব্দিতে চাকমা রাজা হিসেবে যাঁ'কে বা যাঁ'দেরকে চিহ্নিত করেছেন তিনি বা তাঁরা আদৌ Thek বংশের কি না সেটির কোন নিশ্চিত প্রমান নেই । তাই দাইনাক (Daingnet) নামের জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিতভাবে চাকমা জাতির অপর এক শাখা বলা যায় না। বলা যায়, তিনি সম্পূর্ন অনুমানের উপর নির্ভর করেছিলেন। যদিও ইতিহাসে তৎকালে ছেক (Thek) উপজাতির উল্লেখ আছে, কিন্তু 'চাকমা' বলে কোন রাজা অথবা জনগোষ্ঠীর নামই দৃন্ট হয় না। সতীশ চন্দ্র ঘোষ ১৯০০-১০ খৃ:অব্দে থেকে 'চাকমা' নামটি ৬০০ বছর পিছিয়ে গিয়ে ১৩৩৩ খৃ:অব্দে জুড়ে দিয়েছিলেন।

হতে পারে দাইনাক (Daingnet) নামে অভিহিত লোকেরা কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে পরাজিত পরে অনুসারী ছিল এবং বন্দী হয়ে তারা বিজয়ী রাজার নির্দেশিত ভূমিতে কোন ধরনের শ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়েছিল। আরাকানের মধ্যযুগের রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সেটাই স্বাভাবিক। এ ধরনের বিজিত রাজ্যের পূর্বতন রাজার অনুসারী সাধারণ প্রজাগণ তাদের আনুগত্য পরিবর্তনে বাধ্য এবং কালক্রমে তারা বিজয়ী রাজার প্রজারূপেই গণ্য হয়। এখন উপরোল্লিখিত তথ্যবলী ও যুক্তির প্রেক্ষিতে ধারনা করা যায় যে, দাইনাক (Daingnet) গণ ছেক (Thek) উপজাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জনগোষ্ঠির অংশ। হয়তো বা এমনও হতে পারে যে, তাদের পূর্বপুরুষগণ আরাকানের প্রাচীন একটা নগর ধান্যাওয়াদি (Dhannyawadi) তে বসবাস করেছিল বিধায় তারা দাইনাক (Daingnet) নামে পরিচিত ছিল বা হয়েছিল। [উল্লেখ্য যে, মায়ানমার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আবিষ্কৃত একটি ধান্যাওয়াদি নগর সিত্তোয়ে শহর থেকে ৯৫ কিলোমিটার উত্তরে কলাদান ও লেমব্রু নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ভারতবর্ষ থেকে ইন্দো-আর্য ভাষা ভাষী দ্বন চন্দ্র (Dvan candra) নামে একজন পরাক্রমশালী রাজা উক্ত ধান্যাওয়াদি নগর থেকে ৩৭০- ৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানে অধিকৃত অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন ।]

আরাকানের বিগত সাতশ' বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন রাজশক্তির মধ্যে বহু রকমের সংঘর্ষ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সময়ে তথাকার জনজীবন নানারকম বহুধরনের অর্থনৈতিক/সমাজিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে , সে সব হয়তো আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। হত্যা, লুন্ঠন, যুদ্ধ, সংঘাত প্রভৃতি কারনে এক একটি এলাকা বা অঞ্চল কয়েক বছর অথবা কয়েক দশকের জন্য জনশূন্য হয়ে থাকা, নিরাপত্তা এবং শুধু অর্থনৈতিক (জুম চাষাদি) কারনেও সমগোত্রীয় বা সমভাষী জনগোষ্ঠীর বাসস্থান পরিবর্তন ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। আমরা কল্পনা করতে পারি, কালক্রমে বংশপরম্পরা দাইনাকগণের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমতালে নতনু নতুন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এবং গছা বড় হয় অথবা নতুন গড়ে উঠে। দাইনাকগণ সম্ভবত: আরাকানের কোন রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরন করেনি অথবা করতে পারেনি, যখন যিনি রাজ মতায় তখন দাইনাকদের গছা বা গোষ্ঠী প্রধানগণ তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন বা বাধ্য হয়েছেন।

১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্মী বাহিনী কর্তৃক রাজধানী লউংগ্রেট (Launggret) দখল হবার পর আরাকান রাজ মিঙসমউন ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মিন সমউন এর বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়ে ২৪ বছর অবস্থানের সময় আরাকানে চরম অরাজক অবস্থা বিরাজ করেছিল। এমন হতে পারে- মিঙসমউন এর প্রতি অনুগত ছিল বিধায় বর্মী সেনাদের হাত থেকে আত্মরার্থে নিজ নিজ গোত্র প্রধানদের নেতৃত্বে দাইনাকরাও পশ্চিমে আরাকানের শেষপ্রান্তে দক্ষিন চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ করে নাফ নদীর পশ্চিমে এবং মাতামুহুরী নদীর উপত্যাকার দিকে সরে এসেছিল।

গৌড়ের সুলতান জালাল উদ্দিন এর সেনাদের সাহয্যে ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে মিঙসমউন করদ রাজার মত পূন: আরাকানের সিংহাসন লাভ করেন। মিঙসমউন ম্রউক উ (Myauku or Myohaung) তে তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি ছাড়াও এর পর আরাকানে আরো ৪৭ জন শাসক বা রাজা এর নাম পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, উক্ত রাজাগণের অধিকাংশকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শক্তির সাথে যুদ্ধ বা সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হতো।

তবে এটাও হয়তো ঠিক যে, যুদ্ধ ও সংঘাতের ক্ষেত্র সমভূমি, বানিজ্যিক এলাকা এবং রাজধানী ও তার পার্শ্ববর্তী বা নিকটবর্তী জনপদসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো; এ'সবের বাইরে সে সময়ে পার্বত্য এলাকার বিস্তীর্ন অঞ্চল তখন দূর্গম জঙ্গলাকীর্ন এবং প্রায় জনশূন্য ছিল। সুতরাং সংখ্যাল্পতা কিংবা শক্তি-সামর্থ্যের দূর্বলতার কারনে তখন হয়তো তারা দূর্গম পাহাড়ী এলাকায় প্রধানত: জুম চাষের উপর নির্ভর করে এ সময় যাযাবরের মত জীবন যাপন করেছিল।

১৭৮৫ খৃ:অব্দে ব্রহ্মরাজ বোদাপায়া আরাকান দখল করেন। কিন্তু বেশীদিন না যেতেই বর্মীদের বিরূদ্ধে আরাকানীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়; তবে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমিত হয়, বিদোহীগণের অবশিষ্ট অংশ চট্টগামের দিকে পালিয়ে আসে। ডি. জি. ই. হল্ এর মতে ১৭৯৮ খৃ: অব্দে আবার একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং পরিণামে অন্যুন ৫০,০০০ লোকের আর একটি শরনার্থী ঢল চট্টগ্রাম জেলায় আগমন করে।

(সূত্র- on line- `Study on the issue of Ethnicity in Arakan, Myanmar'. By Abu Anin

Published : 11 September 2007 Written by Kaladan News)

এ পর্যায়ে -দাইনাক (তঞ্চঙ্গ্যা) এবং চাকমা সম্পর্কে আরো একটি ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনার প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

কেপ্টেইন লুইন এর মতে- "দৈনাকগণ চাকমাদের একটা শাখা যারা আনুমানিক ১৭৮২ তে রাজা জানবক্স খাঁ'র সময়ে পিতৃকূল পরিত্যাগ করিয়াছে। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অস্বীকৃতি ইহার কারণ। রাজা দৈনাকদেরকে উপজাতীয়দের সাথে সাধারনভাবে আন্ত:বিবাহ সম্পর্ক করার আদেশ জারী করেছিলেন। ইহা ছিল প্রাচীন রীতিবিরুদ্ধ. অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং পরিণামে উপজাতিটা ভেঙে যায়।"

সূত্র- THE HILLTRACTS OF CHITTAGONG AND THE DWELLERS THEREIN . 65 PART II Capt. T.H Lewin

আমার মন্তব্য- দাইনাকদের একটা অংশ যাযাবর জুমিয়া স্বভাববশত: জুমচাষের জন্য চাকমা রাজা জানবক্স এর অনুমতিক্রমে তাঁর শাসিত অঞ্চলে এসে বাস করে থাকতে পারে; তার মানে এই নয় যে তারা চাকমাদের একটা শাখা। যদি তা' হতো তা' হলে তারা অবশ্য রাজার আদেশ মেনে নিতো। অধিকন্তু নিজেদেরকে স্বতন্ত্র মনে করেছিল বলেই তারা স্বজাতীয় প্রাচীন রীতি বজায় রাখতে চেয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য যে- "১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পর আবার আরাকানের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের দিকে শাহ সুজার হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে মোগলদের সাথে আরাকান রাজার বিরোধ শুরু হয়। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল বাহিনী চট্টগ্রাম ও রামু থেকে আরাকানী সেনা ও তাদের সহযোগী পর্তূগীজদের বিতারিত করে।"

"১৬৬৯ থেকে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোগল সর্দাররা পর্যায়ক্রমে আলীকদমে জুমিয়া জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন। ফতে খাঁ (১৬৬৯) থেকে জালাল খাঁ (১৭১৬- ১৭২৪) প্রত্যেকে ছিলেন শাহ্ সুজার সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মাধ্য বা সেনাপতি। রামুতে জমিদারী পরিচালনাকালে জালাল খাঁর সাথে চট্টগ্রামের নবাবের সম্পর্কের অবনতি হলে এক পর্যায়ে চট্টগ্রামের মোগল সেনাধ্য কিষান চাঁদ ও শের জামাল খাঁ অভিযান চালিয়ে আলীকদমের সকল স্থাপনা ধ্বংস করে দিলে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সেখানকার জমিদারী চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এর পর ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দেয়াঙ (বর্তমান আনোয়ারা) এর মোগল বংশীয় জমিদার শেরমস্ত খাঁ আলীকদমে বসবাসকারী সহযোদ্ধাদের জন্য চট্টগ্রামের নবাব জুলকদর খাঁর কাছ থেকে রাঙ্গুনিয়ার কোদালা এলাকার পার্বত্য ভূমি বন্দোবস্তি নিয়ে বসবাস ও জমিদারী প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন এবং উদ্বাস্তু চাকমা জুমিয়াদের জড়ো করে কোদালায় নিয়ে আসেন এবং চাষাবাদে নিয়োজিত করেন।" (পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস- জামাল উদ্দিন, পৃ: ২১৯-২২০)

আবার- "কথিত আছে, ১৮১৯ এর শেষদিকে রাজা ধরম্‌বক্স খাঁ'র সময়ে উপজাতিটার তঞ্চঙ্গ্যা অংশ (The Toungjynya section of the tribe), সংখ্যায় ৪,০০০ লোক, চট্টগ্রামের পাহাড়গুলোকে এসেছিল। তারা জনৈক ফাপ্রু কে তাদের নেতা মেনে চলত, কিন্তু ধরম্‌বক্স খাঁ তাকে তঞ্চঙ্গ্যা গোত্রের (Toungjynya clan) নেতা বলে স্বীকৃতি দেননি, পরিণামে তাদের অধিকাংশ আরাকানে ফিরে যায়।

সূত্র- THE HILLTRACTS OF CHITTAGONG AND THE DWELLERS THEREIN . 65 PART II Capt. T.H Lewin

এখান থেকে (১৮১৯ খ্রীঃ) দাইনাকদের একটা অংশের ইতিহাসের বাঁক (Toungjynya) "তঞ্চঙ্গ্যা" নামে শুরু।

"বার্মা ও ভারতে তঞ্চঙ্গ্যাদের অবস্থান এবং তাদের অন্যান্য বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান" শিরোনামে একটি প্রবন্ধে (ন-আ শমন, ৩য় সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ২০০৬ ইং) এ সি তঞ্চঙ্গ্যা (অনিল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা- প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, ব্যেং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রোয়াংছড়ি) পরিসংখ্যান সহ উল্লেখ করেছিলেন যে- "তঞ্চঙ্গ্যাদের ৭টি গছার লোকজন দাইনাক নামে মায়ানমারে বসবাস করছে। এদের মধ্যে মোগছার লোকজন সবচেয়ে বেশী, দাইনাকদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০%। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে কার্বা গছা, তাদের জনসংখ্যা প্রায় ২০%। তৃতীয় অবস্থানে অঙ্যগছা ও চতুর্থ অবস্থানে লাবুস্যাগছা তাদের সন্মিলিত জনসংখ্যা প্রায় ৩০% এবং বাকী ২০% যথাক্রমে ধন্যা গছা, মংলাগছা ও মেলংগছার লোকজন।" তা'র মতে , আরাকান প্রদেশে মংডু, বুসিডং, প্লাওয়া, ম্রুহং, ক্যকথ, রাসেডং ও মামত্রা জেলা গুলোতে সর্বমোট ১৬,১২২ টি দাইনাক পরিবার বসবাস করছে। প্রতি পরিবারে সদস্য/সদস্যা সংখ্যা গড়ে ৬ জন হিসেবে ধরলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৬,৭৩২ জন। . . . . বলতে পারি মায়ানমারে দৈনাকদের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় এক লাখের মতো।"

দাইনাকদের এই অংশের নাম (Toungjynya) "তঞ্চঙ্গ্যা" হবার পেছনে বেশ কিছু যুক্তি পাওয়া যায়।

যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি- পৃঃ- ৪), শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (তঞ্চঙ্গ্যা পরিচয় পৃঃ- ৫) এবং রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা (তঞ্চঙ্গ্যা জাতি- পৃঃ- ১২) প্রমূখ লেখকগণের মতানুসারে- "তৈনছড়ি থেকে আগত বলে তাঁরা তৈন্-তং-য়্যা / তৈনতংগ্যা / তংচয়্যা নামে অভিহিত হয়েছেন।"

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বান্দরবান জেলার অন্তর্গত আলীকদম উপজেলায় মাতামুহুরীর একটি উপনদী হচ্ছে তৈন্ছড়ী। মারমারা নদী বা খালকে খ্ছ্যং বলেন। তৈন্ছড়ী উপনদীকে মারমারা বলেন তৈন্খ্ছ্যং। "দৈনাকদের একটা অংশ দীর্ঘদিন ধরে তৈনছড়ি এলাকায় বসবাস করে ছিল" (Tanchangya- by Rupak Devnath, page- 89)। তাই তৈন্ছড়ী বা তৈন্খ্যং থেকে আগত রাজানগরে ধরম বক্স খার নিকট আশ্রয়প্রার্থী জনগোষ্ঠীকে যদি রাজ-কর্মচারী বা কর্মকর্তাগণ Taungjynya বলে রেকর্ডভূক্ত করেন তবে সেটাই স্বাভাবিক। Taungjynya থেকে টংতংয়া (চাকমারা যে নামে বলেন), টংতংয়া থেকে বিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশে আগত দাইনাক জনগোষ্ঠির একটা অংশের বর্তমান জাতিগত পরিচয় বাংলা বানানে 'তঞ্চঙ্গ্যা' (Tanchangya) নামে অভিহিত হয়েছে।

সাধারণতঃ অনেকে মনে করেন যে- তঞ্চঙ্গ্যারা চাকমাদের একটি শাখা। এ প্রতিপাদ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য চাকমা জাতির ইতিহাস জানতে চেষ্টা করি। প্রথমে লেখকগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এ' কারনে যে, তাঁদের শ্রমসাধ্য লেখার মধ্য দিয়ে আমি কিছু জানতে পারছি।

তবে এ পর্যন্ত আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি তা' হচ্ছে- ১৭৩৭ পৃঃ অব্দের পূবের্র চাকমাদের সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বিবরনে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। প্রথমতঃ অধিকাংশ লেখাই জনশ্রুতি, কিংবদন্তি এবং অনুমান নির্ভর, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঐতিহাসিক তথ্য পরস্পরবিরোধী। তা' স্বত্ত্বেও সাম্প্রতিক দু'তিনশ' বছরের ইতিহাসের রূপরেখা অনেক স্পষ্ট। এতে দেখা যায়, দুটি জনগোষ্ঠী একটি জাতিতে বিকশিত হবার মত অনেকগুলো শর্ত ছিল। নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার প্রসারতা সম্ভব থাকলে জনসাধারণের মধ্যে ভাষার বিকাশ এবং নৈকট্য বেড়ে যেত।

অবশ্য যারা মনে করেন যে- "তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা জনগণ অতীতে একই জাতি বা গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত কি না সেটি জানা দরকার এবং সে জন্য আগ্রহ থাকলেও বর্তমান যুগে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়"- তাদের সাথে আমি একমত। আমাদের বর্তমান প্রজন্ম তথ্য-প্রযুক্তি যুগের বাসিন্দা। এ যুগে সমগ্র পৃথিবী একটা গ্রাম, একটা রাষ্ট্র একটা পরিবার। আদিম যুগের গোষ্ঠী, মধ্যযুগের বংশ, গোত্র- এ' সব দিয়ে কোন ব্যক্তির পরিচয় জ্ঞাপন এ' যুগে অপ্রয়োজনীয়, অচল। অতীতকে জানতে হয় শুধুমাত্র বর্তমান নিজেকে বা নিজেদেরকে বোঝার জন্য যাতে জীবনযাত্রায় সামনে চলান পথে দিশা খুঁজে পাওয়া যায়।

লেখক- রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০৭ ইং এ অবসরপ্রাপ্ত একজন সহকারী শিক্ষক।

তনচংগ্যা ভাষার জন্ম-মৃত্যু

- কর্মধন তনচংগ্যা

ছোট ছোট জাতিসত্ত্বাগুলি প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এই সংগ্রাম সবাই করে না, করে গুটি কয়েকজন। এই গুটি কয়েক জনের সাফল্যের ফসল ভোগ করে পুরো জাতি। তাঁরা তাদের ভাবনা এবং চিন্তাগুলি সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এই চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে তাঁরা স্বপ্ন দেখেন সংস্কৃতিকে বাচিঁয়ে রাখার সংগ্রামে সবাই সামিল হবেন। আর মাতৃভাষা চর্চা একজন মানুষকে সামাজিকভাবে দায়িত্ববান এবং গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। মাতৃভাষায় চর্চা বা কথা বলতে পারাটায় কিন্তু একটা গৌরবের।

ভাষা হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম, সংস্কৃতির উপাদানও। এই ভাষার উপর সংস্কৃতির অনেক উপাদান বা উপকরণ বিকাশমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংস্কৃতির বৈচিত্র্যতা মধ্যে জাতিগোষ্ঠীভেদে ভাষার বৈচিত্র্যতা এক অনন্য সম্ভার। ভাষা নিয়ে অবিভক্ত পাকিস্তান তথা বর্তমানে বাংলাদেশে ১৯৫২ সালে আন্দোলন হয়েছে। দাবী এবং শ্লোগান ছিল- রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। তখনকার এই ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার জন্য আন্দোলন হয়নি এর সাথে জড়িত ছিল বাঙ্গালী জাতির আত্ম-পরিচয় প্রত্যয়ের একটি চ্যালেঞ্জ, সাথে মাতৃভাষার মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সে আন্দোলনের সাফল্য বাঙ্গালী জাতি পেয়েছে অনেক আগে কিন্তু বিশ্বব্যাপী যে সাফল্য বা স্বীকৃতি সেটি পেয়েছে ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এরপর থেকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে দিবসটি উদযাপন করে থাকে মাতৃভাষার অধিকার এবং স্বীকৃতির স্বারক হিসেবে। এই প্রাপ্তি শুধু বাংলা ভাষার জন্য নয় অন্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর তাদের ভাষা রক্ষা, চর্চা এবং বিকাশের অধিকারের বিষয়টি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

কথা হচ্ছে তনচংগ্যা ভাষার জন্ম-মৃত্যু নিয়ে। তনচংগ্যাদের মোট বর্ণমালার সংখ্যা ৩৬ টি। তার মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণ ৩১টি আর স্বরবর্ণ ৫(পাঁচ)টি। তনচংগ্যাদের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- আকারান্ত। যেমন- কিছিম্যা কা, গছিম্যা খা, চাইন্দ্যা গা, তিনডাল্যা ঘা, ছিলামুআ ঙা। স্বর হচ্ছে কোমল। তনচংগ্যা ভাষা নিয়ে নিজস্ব বর্ণমালা বই প্রকাশিত হয়েছে। বর্ণমালার ক্যালেন্ডারও হয়েছে। তনচংগ্যাদের অন্যতম ভাষা বৈচিত্র্যতা হচ্ছে তাদের অঞ্চল এবং গছাভিত্তিক ভাষা ব্যবহার। যেমন-

বাংলা	কারআ গছা	মো গছা	ধন্যা গছা
ঘর	ঘর/আম্	ঘ(অ)	ঘ(অ)
বাতাস	বুয়ার	ব	ব
পেঁপে	কুইজ্যা গুলা	পেরাছি গুলা	পেরাছি গুলা
লাউ	কুদুগুলা	লো গুলা	লো গুলা
কুকুর	কুর	কুগু	কুগু

ভারত এবং মায়ানমারের তনচংগ্যাদের ভাষাও এই গছাভিত্তিক বৈচিত্রে ভরপুর। তবে তারা পরিচয় বহন করে চাকমা হিসেবে। যেটি তনচংগ্যাদের আসল বা ঐতিহাসিক আইডেন্টিটি। তনচংগ্যাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষা আজ হুমকীর মুখে শুধুমাত্র নিজেদের অসচেতনতায়।

ভাষা মৃত্যু বা হুমকী দুটি কারণে হতে পারে- ক. যখন কোনো ভাষায় কথা বলার মতো কেউ আর বেঁচে না থাকে এবং খ. যখন কোন ভাষাভাষীর মানুষ নিজেরাই সে ভাষাকে অবহেলা করেন বা চর্চা করতে সংকোচ বোধ করেন। দুটি পয়েন্ট আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আমরা যখন নিজেরাই নিজের ভাষাকে চর্চা না করে অবহেলা বা অবজ্ঞা করতে শুরু করবো তখন আমাদের ভাষা মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখা দিবে। ইউনেস্কোর এক গবেষণায় দেখা গেছে গত একশত বছরে মৃত্যু হয়েছে এমন ভাষার সংখ্যা দুইশত এর বেশী। বর্তমানে যে হাজার ছয়েক ভাষা এখনো জীবিত আছে বা কথা বলে তার মধ্যে দুই হাজার ভাষা আশুমৃত্যু হওয়ার হুমকীর মধ্যে রয়েছে। দুইশত ভাষা রয়েছে কথা বলে এমন মানুষের সংখ্যা ১০(দশ) জনেরও কম। আরো দুইশত ভাষা রয়েছে কথা বলা মানুষের সংখ্যা ৫০(পঞ্চাশ) জনেরও কম। আর পৃথিবীতে মোট দুইশত ভাষায় সংবাদপত্র বের হয়। আজ এই দুইশত ভাষার মধ্যে সবার অবস্থাও তেমন ভালো নয়। বাংলাদেশের অনেক আদিবাসীর ভাষার ক্ষেত্রেও সম্ভবত একই ভাগ্য অপেক্ষা করছে। দুই একটি ভাষা বাদ দিলে বাংলাদেশের অধিকাংশ আদিবাসীর ভাষাই বিলুপ্তির পথে। সে জায়গায় আমার প্রিয় মাতৃভাষা 'তনচংগ্যা ভাষা'র কি অবস্থা হবে আমরা ভাবতে পারছি?

এক তথ্যে দেখা গেছে বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। বাংলাদেশের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত প্রায় এক কোটি বাঙ্গালী তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা ব্যবহার করছে। সেখানে নিয়মিত বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর প্রায় ২৮ কোটি লোক তাদের মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ব্যবহার করছে। তাছাড়া ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ও কানাডা থেকে বর্তমানে একাধিক বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। আফ্রিকার একটি দেশ

সিয়েরা লিওন বাংলা ভাষাকে তাদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। ভারত সরকার বাংলাকে তাদের অন্যতম সরকারী এবং দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অনেক আগে থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চীনের বেইজিং রেডিও থেকে বাংলায় অনুষ্ঠানমালা সম্প্রসার করে আসছে। বাংলা ভাষার পৃথিবী ব্যাপি ব্যবহারের পরও বাঙ্গালীর বিশিষ্টজনরা তাদের মাতৃভাষা বাংলা জন্ম মৃত্যু আশঙ্কায় রয়েছে বলে মত দিচ্ছেন। তাদের প্রিয় বাংলা ভাষা আজ বিপদমুক্ত নয় বলছেন। ইংরেজীর ভাষার কাছে বাংলা ভাষা প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছে। আজ এই পর্যায়ে এসে বাঙ্গালীরা যদি আশংঙ্কা করেন যে তাদের বাংলা ভাষার ভবিষ্যত শঙ্কার মধ্যে আছে তাহলে সে জায়গায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জাতিসত্বার ভাষাগুলি অবস্থা ভবিষ্যত কি হবে আমরা আন্দাজ বা ভাবনা করতে পেরেছি ? সে তুলনায় শতকরা হিসাব করলে আমাদের তনচংগ্যা ভাষার অবস্থা কি হবে আমরা অনুমান করতে পারছি। সে জায়গায় যদি আমরা ব্যবহার বা চর্চার ক্ষেত্রে যদি আরো অবহেলা করি।

উদাহরণটি ভাষার সাথে যায় বলে দিতে চাচ্ছি- আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য ভর্তি হলাম তখন এক আদিবাসী বড় বোন জিজ্ঞেস করলো- আপনি কি চাকমা ? (চাকমা ভাষায়)। আমি তাকে সবিনয়ে বলি- দিদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু কি চাকমা ছেলে-মেয়েরা পড়ে ? তখন বড় বোনটি বলে- নাহ্ আমি মনে করেছিলাম আপনি চাকমা। আমি যখন তার সাথে তনচংগ্যা ভাষায় কথা বলি তখন বড় বোনটি বলল- ওহ আপনি তাহলে তনচংগ্যা। আরো নানা আলাপে এরপর আমরা উভয়ে নিজ নিজ পথে চলে গেলাম। রুমে এসে চিন্তা করলাম বাঙ্গালীরা না হয় চাকমা, তনচংগ্যা, ত্রিপুরা, মারমা, খুমি, বম, লুসাই, পাংখোয়া, চাক, খিয়াং বা কে ম্রো চিনতে পারে না বলে সবাইকে 'চাকমা' বলে চালিয়ে দেয়, তাই বলে চাকমারও এই ভুলটি কেন করবে ? তবে কি চাকমারাও পার্বত্য চট্টগ্রামের সব আদিবাসীদের চাকমা হিসেবে মনে করে বা ভেবে থাকে বাঙ্গালীদের মতো ? যদি তাই হয় এটি তাদের জাতির দাম্ভিকতা। তবে আমি মনে করি- বাঙ্গালীরা সব আদিবাসীদেরকে চাকমা হিসেবে বিবেচনা বা মনে করার পেছনে চাকমা জাতির পরিশ্রম রয়েছে। তারা তাদের জাতির পরিচয়কে নানা মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে গেছে। খ. এবার উদাহরণটি দিব এনজিও চাকরি জীবনের। একদিন অফিসের সময় দুপুরে লাঞ্চ বিরতিতে হোটেলে ভাত খেতে এসে কি কি তরকারী আছে জিজ্ঞেস করতে হোটেল মালিক বলল- আপনি কি তনচংগ্যা ? (চাকমা ভাষায় এবং হোটেলের মালিক ছিল চাকমা)। আমি বললাম- হ্যাঁ। আমি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম- আপনি কিভাবে বুঝলেন আমি তনচংগ্যা ? সে বলল- ভাষা শুনে। এখানে উদাহরণগুলি দিলাম ভাষার সাথে সম্পৃক্ত বলে। এখানে একটি বিষয় পরিস্কার যে, আমি যদি তাদের সবার সাথে নিজ মাতৃভাষায় কথা না বলতাম তাহলে এখানে আমার জাতির পরিচয়টির অপমৃত্যু ঘটতো।

প্রাসঙ্গিকতার প্রেক্ষিতে আরো একটা উদাহরণ শেয়ার করছি, দুই বছর আগের একটি ঘটনা। আমার শিশুর বয়স তখন ছিল তিন বছরের একটু বেশী। আমরা তার সাথে নিজের মাতৃভাষায় কথা বলি। তবে আমরা যে জায়গায় থাকি তার আশেপাশে ৯৯% বাঙ্গালী এবং বাংলাভাষী। পাশের বাসার সমবয়সী বাচ্চাদের সাথে সে খেলাধুলা করে। একদিন বাচ্চাটার সাথে তার মা বাংলায় কিছু একটা বলতে গেলে বাচ্চাটি সাথে সাথে বলল-'তুই ম মা নই, তুই বাঙাল' (তুমি আমার মা নই, তুমি বাঙ্গালী)। আমি যখন অফিস থেকে বাসায় আসি আমার সহধর্মিনী বাচ্চার সাথে বলা বিষয়টি শেয়ার করল। আমি কথাটা শুনে মনে মনে চিন্তা করলাম- এতটুকু বাচ্চা কি অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। যে বাচ্চা এখনো ভাষার লাল-নীল, অর্থ, মাতৃভাষা বা মাতৃভাষার অধিকার সর্ম্পকে কিছুই জানে না সে বাচ্চার এই রকম প্রতিক্রিয়া ! আমাকে ভাবনার গভীরে ফেলে দিল। পরনে চিন্তা করলাম মায়ের ভাষার যে নৈকথ্য, ভালোবাসা, মমত্ত্ববোধ, হৃদয়ের যে একটা সুর ভাজে সেটা হয়তো অন্য কোন ভাষায় বা জায়গায় সে খুঁজে পায় না বা তার কানে বাজে না। এই সুরটি ছোট্ট অবুঝ বাচ্চা থেকে শুরু করে সবার মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে হৃদয়েও অনুভূত হয়। তাই তার এই প্রতিক্রিয়া। সে হয়তো তার মায়ের ভাষার সাথে অন্য ভাষাকে মিলাতে পারেনি। যে ভাষার মাধ্যমে সে তার মায়ের সাথে কথা বলে, খাওয়া-দাওয়া করে, ঘুম পাড়ানির গান শুনে, গোসল এবং লেখাপড়া করে বা কান্না করে। এই প্রত্যেকটা বিষয়ের মাধ্যমে সে তার মা বা মায়ের ভাষাকে খুঁজে পায়। এটিই হচ্ছে মাতৃভাষার টান।

অনেক ভাষাবিদ মত দিয়েছেন যে, মাতৃভাষা পঠন-পাঠন একজন মানুষকে মানসিক দতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এক গবেষনায় দেখা গেছে- মাতৃভাষা সুন্দরভাবে পড়তে বা বলতে পারে এমন শিশুর সংখ্যা যদি ১০ শতাংশ বাড়ে, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। আর যে শিশু মাতৃভাষায় দতা অর্জন করতে পারে, সে সহজেই অন্যান্য ভাষা আয়ত্ব বা শিখে নিতে পারবে।

এই ভাষা চর্চা বা রক্ষার জন্য নিজেকেই আগে উদ্যোগী হতে হবে। আমি বা আমরা যদি না পারি সেটি আমাদের ব্যর্থটা আর যারা পারবে সেটি তাদের সফলতা। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা ভাষা অন্য ভাষাভাষীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এটি তাদের সাফল্য। অনেকাংশে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলা ভাষাও মার খাচ্ছে চাকমা ভাষার কাছে। এটির অন্যতম কারণ হচ্ছে এই ভাষার ব্যাপক ব্যবহার বা চর্চা। এই ব্যাপক ব্যবহারের অন্যতম কারণ হচ্ছে মাতৃভাষার তাদের প্রতি প্রেম, দায়িত্ব এবং জাতিত্ববোধ। রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়িতে আমি লক্ষ্য করেছি বাজার-ঘাট এবং অফিস পাড়ার কমন ভাষা হচ্ছে এই চাকমা ভাষা। যেটা বান্দরবানে মারমা-রা

পারেনি। রাঙ্গামাটিতে আমার কিছু পরিচিত স্বজাতিকে আমি দেখেছি তাদের বাসায় কমন বা নিত্য ব্যবহার্য ভাষা হচ্ছে চাকমা। কিন্তু জাতিতে সে চাকমা নয়। এভাবে চাকমারা তাদের ভাষাকে একটি অর্থনৈতিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। চট্টগ্রামের ইপিজেড এলাকায়ও আমি এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছি। চাকমারা যদি তাদের ভাষা নিজে চর্চার মাধ্যমে সবার মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে আমি কেন পারবো না। আর আমি যদি তনচংগ্যা হয়ে তার সাথে চাকমা ভাষায় মত বা ভাব বিনিময় করি সেটি আমার ব্যর্থটা বা মুর্খটা। আমরা অনেকে নিজের ভাষাকে ফেলে অন্য ভাষাকে চর্চা করা গৌরবের মনে করি। এতে নিজেকে হাই কাসের মানুষ ভাবতে শুরু করে দিই। সবার অধিকার বা দায়িত্ব রয়েছে নিজ নিজ সংস্কৃতি চর্চা বা রক্ষা করার। আমি যদি আমার মাতৃভাষাকে চর্চা না করি তাহলে পরবর্তীতে যদি এই ভাষা হারিয়ে যায় তাহলে আর পাওয়ার কিছুই থাকবে না। এই ভাষা নিয়ে ভারতীয় এক বাংলা চ্যানেল সুন্দর একটা বিজ্ঞাপন দেয়' নিজের ভাষায় আবেগ আছে'। আর বলিউডের এক অভিনেত্রী তার বিজ্ঞাপনে বলেন 'আধুনিকতা মানে নিজের পরমপরাকে ভুলে যাওয়া নয়'।

মাতৃভাষা অধিকার নিয়ে লড়াই ভাষা সংখ্যালঘুদেরই করতে হয়। বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙ্গালীদের (জনসংখ্যার পরিসংখ্যান বিচারে বাঙ্গালীরা সংখ্যাগুরু কিন্তু মতা বিচারে সংখ্যালঘু) পাকিস্তানের উর্দু ভাষা নিয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এখন বাংলা ভাষার সাথে সংগ্রাম করতে হচ্ছে আদিবাসীদের, তাদের মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য। আদিবাসীরা বিশ্বাস করে তাদের মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমর্থন প্রয়োজন। মাতৃভাষা বিষয়ে শুধু সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে হবে না বিষয়টিকে নিয়ে আমাদেরও ভাবতে এবং সচেতন হতে হবে অধিকার আর শিকড়ের প্রশ্নে। গণমাধ্যমও এই বিষয়ে সহযোগীতা করতে পারে, স্থানীয় বা বহুলভাবে ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী শব্দ বা জায়গাগুলিকে প্রচারে সহযোগীতা করে।

জাতির ভাষার জন্ম-মৃত্যু নির্ভর করবে তার ভাষাভাষী সদস্যদের চর্চা এবং আগ্রহের উপর। নিজ ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। অন্য কেউ এসে নিবে না। অফিস আদালতে তনচংগ্যা/তঞ্চঙ্গ্যা বানানটি ব্যবহারেও আমাদের সচেতন বা সর্তক হতে হবে। কেউ যদি এই বানানটি লিখতে না পারে তাহলে তাকে সহযোগিতা করতে হবে। তবু সে যেন 'তনচংগ্যা/তঞ্চঙ্গ্যা' বানানটি ভুল না লিখে। আমি এমনও দেখেছি 'তনচংগ্যা/তঞ্চঙ্গ্যা' বানান এর পরিবর্তে 'তং' শব্দটি অনেকে লিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তাদের যুক্তি 'তনচংগ্যা/তঞ্চঙ্গ্যা' বানানটি একটু লম্বা এবং কঠিন, তাই সোজা আর সংক্ষিপ্ত করে 'তং' লেখা হয়। জাতির পদবী কখনো সংক্ষিপ্ত হতে পারে

না। তাই আমাদের সচেতন থাকতে হবে জাতির পরিচয় লেখার ক্ষেত্রে যেন কখনো সংক্ষিপ্ত করা না হয়। কারণ প্রতিটি ডকুমেন্ট ইতিহাস। এখন থেকে যদি আমরা সচেতন না হয় তাহলে পরবর্তীতে আমরা জাতির অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে যে পড়বো না এতে কোন সন্দেহ নেই। তখন বলা হবে 'তং' হচ্ছে একটি আলাদা জাতিসত্ত্বা।

ভাষা হচ্ছে বায়ুবীয়। একে ধারণ করতে হয়, চর্চা করতে হয় না হলে হারিয়ে যায়। বিজাতি বিবাহও স্বজাতির ভাষা অপমৃত্যুর অন্যতম একটি কারণ। একজন মানুষ যদি নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার না করে তাহলে তার মধ্যে চিন্তার শৃঙ্খলা আসে না। আর সামাজিকতা বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠে। তাই শুধুমাত্র ভাষা প্রশ্নে আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে ঘরের মানুষকে দুরের মানুষ বা অনাত্মীয় বলে মনে হয়। আজ থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি- আমার হাতে আমার ভাষার অপমৃত্যু ঘটবে না।

লেখক পরিচিতি: সাবেক ছাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শ্রী রনজিত দেওয়ানের স্বাক্ষাৎকার

- ইন্টু মনি তালুকদার

রনজিত দেওয়ান ১৯৫৩ সনের ৮ আগস্ট রাঙ্গামাটির রাঙ্গাপানি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সনে রাঙ্গামাটি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। তাঁর কর্মজীবনের শুরু ১৯৭৭ সনে থেকে জেলা গণসংযোগ দপ্তরে ভ্রাম্যমান পল্লীর গায়ক হিসাবে। তিনি ১৯৭৮ সন থেকে ১৯৮১ সন পর্যন্ত চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের পাহাড়িকা অনুষ্ঠানেও কাজ করেন। তিনি মোনঘর আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে বর্তমানে অবসর গ্রহণ করেছেন। ছাত্র জীবনে তিনি তৎকালীন পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং পরবর্তীতে সিনিয়র ভাইচ-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি একজন গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী। আদিবাসী চাকমাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বেতার শিল্পী। তিনি ১৯৭৩ সনে ঢাকায় বাংলাদেশ বেতার ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে এবং ১৯৭৪ সনে চট্টগ্রাম বেতারে লোক সংগীত অনুষ্ঠানে সর্ব প্রথম চাকমা গান পরিবেশন করেন। এতদ্‌ঞ্চলে চাকমা গান ও ধর্মীয় গানের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রদূত। তিনিই সর্বপ্রথম চাকমা গানের ক্যাসেট বের করেন। তাঁর চাকমা গানের ক্যাসেটের সংখ্যা ২টি এককসহ ৮ এবং ধর্মীয় গানের ক্যাসেটের সংখ্যা ৪টি এককসহ ৭। তিনি গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠি ও গিরিঝংকার শিল্পীগোষ্ঠির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি সংগীত, নৃত্য ও চারুকলা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ফিবেক একাডেমীর প্রধান উপদেষ্টা। তিনি চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী বিজু নৃত্যের উদ্ভাবক এবং বিভিন্ন সময়ে বিটিভি, সিটিভি, এনটিভি ও একুশে টিভিতে সংগীত পরিবেশন করেছেন। ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির প্রেক্ষাপটে তাঁর রচিত ও সুরারোপিত 'চেঙে-মেইনী-কাচালং' গানটি দেশ-বিদেশে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এতদ্‌ঞ্চলে ধর্মীয় চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গুনী শিল্পীকে সম্মাননা প্রদান করেন। তৎমধ্যে ফিবেক একাডেমী ও রাঙ্গামাটি শিল্পকলা একাডেমী উল্লেখযোগ্য।

শ্রী ইন্টু মনি তালুকদার ঃ নমস্কার আপনি কেমন আছেন?

শ্রী রনজিত দেওয়ান ঃ ভালো আছি।

শ্রী ইন্টু মনি তালুকদার ঃ ক'বছর বয়স থেকে গানে মন গেল। গানের জন্যে আশপাশের পরিবেশে কাউকে কি ওস্তাদরূপে পেয়েছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলুন। পারিবারিক পরিবেশ কি আপনার গান করার পক্ষে সহায়ক ছিল?

শ্রী রনজিত কুমার দেওয়ান ঃ একদম ছোট বেলায় মানে ৬/৭ বছর বয়স থেকে গানের প্রতি অদম্য কৌতুহল জন্ম নেয়। সে বয়সে রেডিও কিংবা গ্রামোফোনে গান শুনে গুন গুন করার চেষ্টা করতাম। আর অবাক হয়ে ভাবতাম এত সুন্দর

সুন্দর গান কারা কোথা থেকে কিভাবে গায়? যদি দেখতে বা জানতে পারতাম! মজার ব্যাপার গ্রামোফোন রেকর্ড গান যখন বাজতো, গ্রামোফোনের এক পাশে গর্তের মত জায়গা ছিল (যা হাতে ঢুকানো যাওয়ার মত) তাতে মাথা নীচু করে চেয়ে দেখতাম কারা ভিতরে গান করছে আর কিভাবে ছোট জায়গার মধ্যে এত জন আছে? খুবই বিস্ময় বোধ করতাম। অবচেতন মনে গানের দিকে মন ঝুঁকে পড়ে। আরো মজার ব্যাপার যে যখন ১৯৬১ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি আমার এক আত্মীয় বিয়ের সময় "ভারতীয় বাংলা গান" নামে একটি গানের বই উপহার পেয়েছিলাম। ঐ গানের বইটি থেকে পছন্দমত গান দেখে দেখে নিজেই সুরকরে গাইতাম। জানাছিলনা যে ঐ গান গুলো সুরকরা এবং রেকর্ডকৃত ভাবলে হাসি লাগে তখন হারমোনিয়াম বাজানো দূরের কথা, চোখেও ভালোভাবে দেখিনি।
স্মরণযোগ্য যে, ১৯৬১/৬২ সনে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় Pakistan Arts Council ছিল বর্তমানে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পশ্চিম পার্শ্বের স্থানটিতে। ওখানে প্রায় সময় নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হতো। সে সময় জয়শ্রী রায়, তৃপ্তি তালুকদার, জয়তী রায়, বিমলেন্দু দেওয়ান প্রমুখ শিল্পীরা রাঙ্গামাটি ছোট্ট শহরটিকে গানে মাতিয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের গান শুনতে যেতাম। পিচ্ছি বলে কেউ পাত্তা দিতনা, এমনকি দয়া করে কেউ ঢুকতেও দিত না। বাইরে থেকে কেবল গান শুনে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাতাম। তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম "আমিও একদিন গান করবো। আমাকেও একদিন হাজার জনতায় দেখবে! আমার গান শুনবে।" সে সময়ে শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, সুনীতি বিকাশ বড়ুয়া, কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া, হিমাংশু বিশ্বাস উনাদের নিকট হতে যা পারি অল্প-সল্প শিখে ছিলাম। এখানে বলি যে, আমি কোন বড় শিল্পী নই, সঙ্গীতে আমার তেমন কোন জ্ঞান নেই। তখন বর্তমান সময়ের মত গান শেখার সুযোগ কম ছিল। পারিবারিক পরিবেশে প্রথম দিকে গান শেখার পরিবেশ ছিলনা। অনেক পরে কিছুটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়; তাও সংগ্রাম করে।
খন্ড (উনারা সস্নেহে যত্ন সহকারে শিখাতেন। আমরা যারা শিখতাম শ্রদ্ধা করতাম। তখন আলাদা একটা আন্তরিকতার ছোঁয়া ছিল যা এখন বড় একটা দেখা যায়না) গানের সাথে তবলা শিখছি জেনে বাবা ত্যাজ্য পুত্র করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আমিও দমবার পাত্র ছিলাম না। দু'দিন অনশন করলে শেষ পর্যন্ত মত দিতে বাধ্য হন।

শ্রী ইন্টু মনি তালুকদার ঃ মা-বাবাসহ পারিবারিক পরিচিতি বর্ণনা করুন। কৈশোর তারুণ্যে কি গান নিয়ে কোনো উন্মাদনা বা মেতে থাকার ঘটনা স্মরণে আসে? এই সংশ্লিষ্ট বন্ধুবান্ধব, শুভানুধ্যায়ীদের কথা বলুন।
শ্রী রনজিত কুমার দেওয়ান ঃ ১০২নং রাঙ্গাপানি মৌজার অর্ন্তগত কাটাছড়ি নিবাসী গুজঙ্যে কার্বারীর কন্যা সন্তান কালিন্দী, পুত্রসন্তান জয় মুনি। রাজা ধরম

বক্স খাঁ কালিন্দীকে রাণী করলে হন কালিন্দী রাণী। রাজা ধরম বক্স খাঁ (আমার ভুল না হলে) গুজঙ্যে কার্বারীকে দেওয়ান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ১০২ নং রাঙ্গাপানি মৌজাটির হেডম্যান করেন। সেই থেকে কাপ্তাই বাঁধের আগ পর্যন্ত বংশ পরমপরায় রাঙ্গাপানি মৌজাটি আমাদের ছিল যা বর্তমানে ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায় হেডম্যান হিসাবে আছেন। গুজঙ্যে দেওয়ানের পুত্র সন্তান জয়মুনি দেওয়ানের দু'টি পুত্র সন্তান ১) কমলা কান্ত দেওয়ান ২) চন্দ্র কান্ত দেওয়ান। যা বড় দেওয়ান ও ছোট দেওয়ানের চার মেয়ে ও চার ছেলে ছিল। তার মধ্যে মেজো মেয়ে ভূবন মোহন রায়ের প্রথম সহ ধর্মীনি রাণী দয়াময়ী। চার পুত্র সন্তানের মধ্যে যথাক্রমে ১। জয় কুমার দেওয়ান ২। বিজয় কুমার দেওয়ান ৩। যোগেন্দ্র কুমার দেওয়ান ও ৪। রাজ কুমার দেওয়ান। ব্রিটিশ আমলে মৌজা পরিচালনার সুবিধার্থে আমার পিতা যোগেন্দ্র কুমার দেওয়ান রাঙ্গাপানিতে এসে বসতি স্থাপন করেন। সে অবধি আমরা রাঙ্গাপানিতে বসবাস করছি। তিনি ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সালে পরলোক গমন করেন। মাতা লালনা দেওয়ান। ৬ ভাই ৫ বোনের মধ্যে আমি সবার বড়। বোনদের মধ্যে বড় দুই বোন মারা গেছেন। সবার ছোট বোন এবং তৃতীয় ভাই কানাডা প্রবাসী। বাকীরা বিভিন্ন পেশায় রত আছে।

নির্দ্দিষ্ট কোন একটি গান নিয়ে উন্মাদনা নয় বরং সর্বদাই গান নিয়ে নেশা বা উন্মাদনা ছিল। যেমন- পাঠ্য বইয়ের পড়া মুখস্ত হলেই টেবিল চাপড়িয়ে গুন গুন করা, ভাত খাওয়ার সময় গান, স্নান করতে গেলে গান, কোথাও বেড়াতে গেলে পথে গান এই রকম আরকি! মনে সব সময়ই ভাবনা ছিল একদিন গানের শিল্পী হবো। মাথায় চিন্তা খেলতো অন্যেরা গানলিখতে পারলে আমি কেন লিখতে পারবো না। অন্যেরা সুর করতে পারলে বা গাইতে পারলে আমি কেন পারবো না। গানের ক্ষেত্রে আমার আদর্শ হলেন ভূপেন হাজারিকা। প্রেরনা হলেন জনগণ এবং তাঁদের ভালবাসা। মেহেদী হাসান, মোঃ রফি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিশোর কুমার, মান্নাদে, শ্যামল মিত্র, লতা মুঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আশা ভোঁসলে এঁরা হলেন গানের প্রেরণার উৎস শিল্পী হিসেবে। লক্ষ্য ছিল একটাই গান গেয়ে জাতিকে জাগাবো শুভানুধ্যায়ী হিসাবে একজনের কথাই বেশি বার বার বলতে হয়- তিনি হলেন কুমার নন্দিত রায় (রেণী বাবু) এর শাশুড়ী মা মিসেস প্রতিমা চাকমা (হুক্কিমা)। আপন ছোট ভাই এর মত অত্যন্ত স্নেহ করতেন। দু'তিন দিন গান করতে না গেলে তাঁর ছেলে বা মেয়েকে দিয়ে ডেকে পাঠাতেন। গেলে জিজ্ঞেস করতেন "এতদিন কোথায় ছিলে? গান করতে আসনি কেন? যাও হারমোনিয়াম নিয়ে বস। তোমাকে একদিন বড় শিল্পী হতে হবে।" আমার জন্মদাত্রী মাও এরকম উৎসাহ কোনদিন দেননি। দিদির স্বপ্নেহভরা আশা হয়তো পূরণ করতে পারিনি। তিনি আমায় মা করুন। তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক। যেখানেই জন্ম গ্রহণ করুন সুখী হোন। গানের প্রসঙ্গ আসলে অবশ্যই আর এক

জনের কথা বলতে হয়। তিনি হলেন বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ মি: চাচ্চি। ঘটনাটা সংক্ষেপে বলি, ১৯৭৫ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে চোখের চিকিৎসার্থে চট্টগ্রাম শহরে যাই। কাজসেরে পরেরদিন সকালে রাঙ্গামাটি ফেরার উদ্দেশ্যে কাউন্টারে টিকিট কাটি। গাড়ী ছাড়ার ঘন্টা খানেক দেরী ছিল। সেখানে নিশিধন (পিত্তর) এবং আনন্দ বাবুর (ওগোলছড়ীর হেডম্যান চিত্ত বাবুর ছোট ভাই) সাথে দেখা হয়। বিশ্রামের জন্য উনাদের সাথে হ্যাপীলজে চার তলায় উনাদের কামরায় যাই। ওখানে মি: চাচ্চি এর সাথে দেখা হয়। নিশিধন ও আনন্দ বাবুর হাত দেখার পর অনেকটা জোর করে আমার হাত দেখেন। আমার হাত দেখে বললেন সবই সত্যি ছিল। এবং বললেন আমি নাকি গানকরি। উনাকে বাজিয়ে দেখার জন্য উপস্থিত তিন জনেই বললাম- "আমি গান পারিনা।" চ্যালেঞ্জের মুরে বললেন উনার গনণা নির্ভুল। আজ পর্যন্ত মিথ্যে হয়নি উনার গনণা। নিশিধনকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম "উনি গান করেন।" মাথা নাড়িয়ে বার বার বলতে লাগলেন নিশিধন নয়- আমি গান করি। গান না করলেও গানের গলা আছে। উঠে আসার সময় আমার হাত দুটো ধরে বললেন, বাবু আমার অনুরোধ রাখবেন? আপনার গানের গলা আছে। ওস্তাদের কাছে গান শিখুন, দেখবেন আপনার অনেক নাম হবে। একদিন আমাকে স্মরণ করবেন।"

শ্রী ইন্টু মনি তালুকদার ঃ মুক্তিযুদ্ধকালে আপনার বয়স কত ছিল? কীভাবে দেখেন মুক্তিযুদ্ধকে? ৭০ দশকের প্রায় মাঝাপর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমিয়া জাগরণের আন্দোলনটা বেশ আলোচনায় চলে আসে গণমাধ্যমে। এ আন্দোলনে আপনার কোনো ভূমিকা বা অংশগ্রহণ ছিল কী? বিস্তারিত বলুন।

শ্রী রনজিত কুমার দেওয়ান ঃ মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ১৮/১৯ বছর। তখন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলাম। তখনকার প্রোপটে ছাত্রদের ১১ দফা, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফাদাবী যথাযথ ছিল মনে করি। জুলফিকার আলীভুট্টো আর ইয়াহিয়াখান যদি রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পারতেন তাহলে এতবড় রক্তয়ী মুক্তিযুদ্ধ হতো কিনা তা ভাববার অবকাশ রয়েছে বলে মনে করি। মোদ্দাকথা হলো চুড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং অবশ্যই সঠিক ছিল।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলে নাম হয় "গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।" দীর্ঘ পচিশ বছর গণতন্ত্র ছিলনা, জনগণের বাক স্বাধীনতা ছিলনা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্ম হলে কথাবলার অধিকার ফিরে পাই। তখন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন দাবী আদায়ের পক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে সে সময়ের পাহাড়ী ছাত্র সমিতির পক্ষ থেকে তিনটি প্রতিনিধি দল গঠন করা হয়। একদল বান্দরবান, দ্বিতীয় দল মারিশ্যা এবং তৃতীয় দল চেঙ্গী, মাইনী ভ্যালি গমন করে। তৃতীয় দলে আমিসহ ৬ জন ছিলাম।

যথাক্রমে চাবাইমগ সভাপতি, পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ও দলনেতা, শ্রী উষাতন তালুকদার (বর্তমান এমপি মহোদয়) সুবোধ বিকাশ (বর্তমান কানাডা প্রবাসী) জিতেন্দ্রীয় গুংগু, প্রমোদেন্দু (নুক্ক) (হৃদয় মার্কেটের মালিক) এবং আমি। প্রায় চৌদ্দ, পনের দিন চেঙ্গী ও মাইনী ভ্যালি সাংগঠনিক সফর করি। এই সাংগঠনিক সফরে একদিকে বক্তৃতা দিতে হতো তেমনি গানও করতে হতো আমাকে। এভাবে শুরু হয় আমার ছাত্র রাজনীতি। পরবর্তীতে জে, এস, এস পতাকা তলে রাজনীতি। একদিকে গান করতাম রাঙ্গামাটি ও এর বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অন্যদিকে গ্রামে গিয়ে সাংগঠনিক কার্য্যক্রম চালাতাম ও রাজনীতি গান করতাম। বিশেষ করে মারিশ্যায় মাইনীতে ও কয়েকবার। ছাত্ররাজনীতি করার সময় শুধুমাত্র একবার রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলাম। ১৯৭২-৭৩ মেয়াদে কেন্দ্রীয় কমিটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে, ১৯৭৩-৭৪ মেয়াদে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। ৭০ দশকের মাঝামাঝিতে যখন অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু হয় তখন আমি রাঙ্গামাটিতেই ছিলাম। কৌশলগত কারণে রাঙ্গামাটিতে থাকতে হয়। প্রিয়নেতা সন্তু লারমার নির্দেশে বিপ্লবী শিল্পীদল গড়ে তোলার দায়িত্ব ছিল। কার্যক্রম ও চালিয়েছিলাম বছর দেড়েকের মত। দুর্ভাগ্য সফল হতে পারিনি। কেননা সে সময়ে যারা গান চর্চা করতো ভেতরে ভেতরে রোমান্টিকতার যোগে পেয়েছিল। এটা জানতে পেরে বন্ধ করতে বাধ্য হই। এটা আমার দুর্ভাগ্য এবং চরম ব্যর্থতা।

শ্রী ইন্টু মনি তালুকদার ঃ প্রায় পুরোটা ১৯৮০'র দশক এদেশে ছিল প্রত্য সামরিক শাসন। এই সময়ে একজন শিল্পী হিসেবে আপনার দিনকাল কেটেছে কেমন, জানতে চাই।

শ্রী রনজিত কুমার দেওয়ান ঃ ১৯৭৮ এর শেষের দিকে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত পাহাড়িকা অনুষ্ঠানে চাকমা ভাষার অনুষ্ঠান চালানোর জন্য চট্টগ্রাম শহরে চলে যাই। তিন বছর পর ৮১ এর নভেম্বরের ৬ তারিখ চট্টগ্রাম শহর ত্যাগকরে প্রিয়নেতা সন্তু লারমার আহ্বানে সরাসরি আন্দোলনে যোগদিতে চলে যাই। বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র চালানোর প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য অন্যদেশে চলে যাই। জাতির চরম দুর্ভাগ্য যে, কুরুক্ষেত্র (ভ্রাতৃঘাতিযুদ্ধ) হওয়ার কারণে স্বপ্ন পূরণ হলোনা। শ্রদ্ধেয় বনভান্তের উক্তিটি মনে পড়ে "আশার তরনী ডুবিল সাগরে শূণ্যদেউল শুণ্যঘর- জানিনা কাহার রুদ্র প্রতাপে পথের ভিখারী হইল অমর।" চার বছর পর ৮৫ এর শেষের দিকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি জন্মদাত্রী মা আনতে গেলে। পার্বত্য চুক্তির পর্যন্ত বাকী সময়টুকু কেটেছিল ভয় শংকা আশা নিরাশার দোলাচলে ঘড়ির পেন্ডুলাসের মত।

শ্রী ইন্টু মনি তালুকদার ঃ ১৯৯০'র গণআন্দোলনের পর নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসে। ওই সময়ে শিল্পী এবং সচেতন মানুষ হিসেবে আপনি কেমন সময় অতিবাহিত করেন?

শ্রী রনজিত কুমার দেওয়ান ঃ ৯০ এর গণ আন্দোলনের সাধারণ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বাতায়ন তৈরী হয়েছিল তৎ প্রেক্ষিতে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসে আরো দশজন সাধারণ নাগরিকের মত আমারও প্রত্যাশা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দিনের সমস্যার সুস্থ সমাধানের পথ সুগম হবে। তা না হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবে মনে শংকা, অস্থিরতার আবর্তে দিন কাটাতে হয়েছিল।

শ্রী ইন্টু মনি তালুকদার ঃ ৯০ দশকের প্রায় শেষ প্রান্তে (১৯৯৭) পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হল। দেশের মানুষ একাত্ম হয়ে গেল ওই ঐতিহাসিক চুক্তির সারমর্মে। পাহাড়ী জীবনের গীতিকবি ও কণ্ঠশিল্পী হিসেবে এ বিষয়ে আপনার অভিমত জানান।

শ্রী রনজিত কুমার দেওয়ান ঃ ৯৭ এর পার্বত্য চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।" সমগ্র পার্বত্য আদিবাসীদেরমত আমিও আনন্দিত ও আশ্বান্বিত হয়েছিলাম। দুঃখের বিষয় কানা মামা তার ভাগ্নেকে ভুলে গেছে।

শ্রী ইন্টু মনি তালুকদার ঃ গানে চিরকাল প্রেমময়তা, মানুষের প্রতি মানুষের আশা আকাঙ্খার কথা প্রকাশ করে গেলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনগুলোর কাছে আপনার স্বপ্ন প্রত্যাশা কী? বিস্তারিতভাবে বলুন।

শ্রী রনজিত কুমার দেওয়ান ঃ যেহেতু আপনি আমাকে "একজন সচেতন মানুষ" হিসেবে উল্লেখ বা সম্বোধন করেছেন, তাই বলি একজন সচেতন মানুষের সমাজের কাছে, জাতি ও প্রজন্মের কাছে অনেক প্রত্যাশা থাকতে পারে যে, গুলো দ্বারা জাতি ও সমাজ টিকে থাকবে, সামনে এগিয়ে যাবে, বিশ্বদরবারে নিজের পরিচয় তুলে ধরবে অর্থনৈতিক, সমৃদ্ধি, ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ; জ্ঞান বিজ্ঞানে ও প্রগতিশীল সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে।

শ্রী ইন্টু মনি তালুকদার ঃ আপনাকে ধন্যবাদ।

শ্রী রনজিত কুমার দেওয়ান ঃ আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

লেখক : ইন্টু মনি তালুকদার, রেগা প্রকাশনী, টিএন্ডটি, রাঙ্গামাটি।

"তনচংগ্যা জাতি, দৈংনাকঃ এবং কিছু ইতিকথা"

- মিলিন্দ তনচংগ্যা।

"জাতি এক ধরণের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্প্রদায়। জাতিবোধ একটি নৈতিক এবং দার্শনিক চেতনা যা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়।" জাতি লিখে উইকিপিডিয়ায় সার্চ করি আর উপরোক্ত এ জাতির সংজ্ঞায় চলে আসে। গত ক'দিন যাবত ফেসবুক দুনিয়ার বাইরে থাকায় অনেক কিছু আলোচনা, সমালোচনা থেকে দূরে থাকি। যখনি ফের ফেসবুকে আসি তখন দেখি আমার ইনবক্সে বেশ কিছু স্ক্রিনশটে ভরে যায়। আমি স্ক্রিনশট ভাষা গুলোর একটা লাইন বলি-

"তঞ্চঙ্গ্যা হলো চাকমা জাতির উপজাতি! রাজা এক, ভাষা এক, বর্ণমালা এক, রাধামন ধনপুদিও এক" পরে আমি নিজে তার ওয়ালে গিয়ে দেখি রীতিমতো কথার যুদ্ধ লেগেছে। যা আমি আশ্চর্য ও মর্মাহত হয়েছি।

এ লাইন কে লিখেছেন তার নাম আমি পাবলিকের সামনে বলার পাত্র নয়। অন্তত তার আত্মসম্মান বজায় রাখার স্বার্থ বিবেচনায় এনে। কেউ যদি কাউকে হেয় করে কিছু উপহাস করে লিখে, তার পালটা প্রতিক্রিয়া দেখানো প্রয়োজন বোধ করিনা। তাই নিজের এ অবতারণা।

এবার আসি আসল কথায়, সরকার যখন পাহাড়ের লোকদের বলে তোমরা উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। তখন আমাদের গায়ের রক্ত কাঁপে, প্রতিক্রিয়া দেখায়। তখন বলি সরকার ফ্যাসিবাদী আচরণ করছে, সরকারের চাপিয়ে দেওয়া পরিচয় আমি মানিনা, মানবোনা। তখন আমিও আমার মতো প্রতিবাদ করি, সুযোগ পেলে মিছিলে যোগ দিই, বক্তব্য দিই। কারণ সেই পরিচিতি করণের মধ্যে রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য যেমন আছে তেমনি অন্যকে বঞ্চিত করার প্রবণতা আছে। হ্যাঁ, মানছি কারোর কথায় কারোর পরিচিত হারায় না কিন্তু আমি বলি হারায়। কেন হারায়? একটা কথা বলতে বলতে তা পরে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং মানুষ সত্য বলে চালিয়ে যায় কোন একদিন তা সত্যরূপে গণ্য হয়।

অনেকের কাছে এরকম প্রশ্ন কাজ করে তনচংগ্যারা জাত নয়, তারা চাকমার উপজাত। কথাটার মধ্যে কেমন জানি একটা ইগো কাজ করে, কাজ করে ফ্যাসিবাদী আচরণ। আবার অনেকে আগবাড়িয়ে বলে তঞ্চঙ্গ্যারা চাকমার একটা গছা। কিন্তু কথাটার কোন ভিত্তি নেই, কেননা সবকিছু ইতিহাসের বিচার্য বিষয় এবং ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় যেতে হবে। চাকমা জাতিগোষ্ঠীর গছাতেও তঞ্চঙ্গ্যা গছা নামে কোন গছা উল্লেখ নেই। শুরুতে বলে রাখি এটা জাতিগত বিদ্বেষ নয়, এটা প্রোপাগান্ডার বিপরীতে প্রতিক্রিয়া মাত্র। আর কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা তথ্য দিয়ে উস্কানো কথা বলে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের দুরত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করছে। যেটা সরকারও করে।

আমি স্পষ্ট বলছি তনচংগ্যা একটি জাতি এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তনচংগ্যার কী নেই?
তঞ্চঙ্গ্যাদের আছে-
১. নিজস্ব বর্ণমালা।
২. নিজস্ব ভাষা।
৩. নিজস্ব পোশাকাদি।
[পিনন (থামি), চকচকে লালরঙের খাদি (উড়না), কারুকাজ করা লম্বাহাত জামা, পাউদুরি (কারুকাজ করা কোমর বন্ধনী), মাথা খবং (কারুকাজ করা পাগড়ী জাতীয় বিশেষ), ধুতি, লম্বাহাত জামা (পুরুষের)
৪. নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি বা প্রথা বা বিচার বিচারব্যবস্থা।
৫. নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম ও আচার ইত্যাদি।
৬. নিজস্ব ভূখণ্ড (যেখানে বাস করছে)
আর কী চায় আপনার একটা জাতি পরিচয়ে?
অনেকে বলে চাকমা ভাষা আর তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার মিল আছে। তা বলার যথেষ্ট যুক্তি আছে, কিন্তু যারা যুক্তি দেখান তারা ভিন্নভাবে দেখান। উনারা গড়ে বলেন তনচংগ্যারা চাকমার উপজাতি বা শাখা।

ভাষাগত পার্থক্য:
ভাষা কেন এক বলি, চাকমা ভাষা আর তনচংগ্যা ভাষা ইন্দো- আর্য ভাষা থেকে উদ্ভুত। [পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট- রাঙামাটি। সম্পাদনায় শুভ্রজ্যোতি চাকমা]
কিন্তু কিঞ্চিত পার্থক্য হয় এ জায়গায় "তনচংগ্যাদের ভাষা ভারতীয় আর্যভাষা সম্ভূত বাংলার আদিরূপ। বহুপালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা পরিপূর্ণ। তবে ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন তনচংগ্যা ভাষা আর চাকমা ভাষার মিল বা ঘনিষ্ঠতা সমধিক। সংস্কৃতরূপ অপো পালিরূপ তনচংগ্যা ভাষা নিকটতর। [পহর জাঙাল, সম্পাদনায়- পলাশ তনচংগ্যা, চবি/২০০৩। "তঞ্চঙ্গ্যা ও তাদের ভাষা রূপ প্রসঙ্গ- ড. মনিরুজ্জামান", বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]
তনচংগ্যা ভাষা আর চাকমা ভাষার তুলনা বিশ্লেষণ-
চাকমা:----তনচংগ্যা:----মন্তব্য
- কুদু----কুদি/কুরি----উ/ই; দ/র।
- হিয়্যচ--খাইয়ৎ/খিয়ৎ----ই/আই।
- বেই----বা'ই/ভাই----এ/আ; ব/ভ।
-বোন----বইন/বোঞ----ও/অই; ন/ ঞ।
- আগ----আহ/ আয়----গ/হ, য়।
- জিয়্যে---গিয়্যে------জ/গ।

এ পার্থক্য থেকে অনুমান করা যায়, তনচংগ্যা ভাষা ও চাকমা ভাষা একিশ্রেণী ভুক্ত ভাষার আদিরূপ হতে পারে; উচ্চারণ, শব্দতত্ত্বগত, ধ্বনিতত্ত্বগত তার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

তনচংগ্যাদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে। মোট অর/বর্ণমালা আছে ৩৬ টি। তন্মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণ ৩১ টি, আর স্বরবর্ণ ৫ টি। এই বর্ণমালাতে নিজস্ব কার ফলা চিহ্ন আছে। [চাৗলেন, রাঙামাটি/২০১৪ খ্রীঃ- সম্পাদনায় মিলিন্দ তনচংগ্যা। "তনচংগ্যা ভাষা, বর্ণমালা এবং ব্যাকরণ প্রসঙ্গ- লিখেছেন শ্রী: কর্মধন তনচংগ্যা,"]

তনচংগ্যাদের অধিকাংশ মায়ানমার বা বার্মায় আরাকান প্রদেশে অবস্থান করছে বলে জানা যায়। যারা দৈংনাক নামেই পরিচিত। তাছাড়া ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, অরুণাচল ও মণিপুর দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে তনচংগ্যাদের সংখ্যা সমধিক। তনচংগ্যারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং থেরবাদী। তনচংগ্যাদের মধ্যে শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথের যাঁর গৃহীর নাম ফুলনাথ তঞ্চঙ্গ্যা (১৯১৩-২০০৮), এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যিনি ১৯৫৪-৫৬ সালে রেঙ্গুনে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ মহাসংগীতিকারকে ত্রিপিটক বিশোধক কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই মহাসংগীতিকারকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য থেকে এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার গৌরব অর্জন করেন। এবং উক্ত মহাসংগীতি আয়োজক কমিটি "বুদ্ধ শাসন কাউন্সিল" তাকে 'অগগ মহাপন্ডিত' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।

[সূত্র- পহর জাঙাল/২০০৮; চবি, সম্পাদনায়- কর্মধন তনচংগ্যা। উক্ত প্রকাশনার উৎসর্গ অংশ]

শুধু তিনি নন, শ্রীমৎ মোনন্দ মহাথের, শ্রীমৎ আর্যনন্দ ভান্তেসহ আরো অনেক তনচংগ্যাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারক ছিলেন।

হ্যাঁ, রাজগুরু ভান্তে (অগ্রবংশ মহাথের যিনি রাজগুরু ভান্তে নামে সমধিক পরিচিত, এবং আমৃত্যু চাকমা রাজ বিহারে অবস্থান করেন, ১৯৫৮ সালে জানুয়ারি মাসের কোন এক তারিখে চাকমা রাজা মেজর ত্রিদিব রায় ভান্তেকে এক ধর্মীয় মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজগুরু পদে বরণ করেন।) নিজেকে চাকমা হিসেবে দাবি করার নেপথ্যে নিশ্চয় যুক্তি আছে। বেশি দূর নয় আপনি এখনকার সমাজে চাকমা বুড়োবুড়িদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন "তনচংগ্যারা হলো খাঁটি চাকমা" এবং আমি নিজেও স্বয়ং এ কথা শুনেছি। তাহলে সাধারণ প্রশ্ন জাগে নকল চাকমা কারা? সেটা ঐতিহাসিক ও ইতিহাস বিচার্য বিষয়। আর তনচংগ্যারা কেন তনচংগ্যা লিখে তার ব্যাখ্যা নিচের অংশে দিয়েছি।

আর রাধামন ধনপুদি নিয়ে চাকমা সমাজে অনেক লোক কাহিনী আছে, তেমনি তনচংগ্যা সমাজেও অসংখ্য লোককাহিনী আছে। সেটার গল্প বলতে লিখতে গেলে আপনাকে হাজার বছরের পিছনে ফিরে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে লেখক বা ইতিহাস

ব্যাখ্যাকারীর ব্যক্তিসত্তা ও স্বতন্ত্রটা খুবই জরুরি। কেননা বিজিত শ্রেণি সবসময় নিজের মতো এবং নিজেকে হাইলাইট করে ইতিহাস রচনা করেন। যেমন, জ্যান্ত উদাহরণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইতিহাস। অথচ কত আদিবাসী পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা নির্যাতিত নিপীড়িত হয়, কত মা বোন ইজ্জত সমভ্রম হারায় কিন্তু রাজা ত্রিদিব রায়ের একটা সিদ্ধান্তে গোটা আদিবাসীদের বাংলাবিরোধী চালিয়ে দেওয়া হয়।

০২.

দাইনাক বা দৈংনাকদের উৎপত্তি সংক্রান্ত যে বিবরণ "চাকমা জাতি" (১৯০৯) ইতিহাস গ্রন্থে সতীশ চন্দ্র ঘোষ প্রদান করেছেন তাতে দেখা যায়, ১৩৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে আরাকানধিপতি (কোন কোন গ্রন্থের বৃহ্ম সম্রাট) মেঙ্গদি মনিজগিরির (মইচাগিরি) রাজা ইয়ংজকে সুকৌশলে আক্রমণ করলে ইয়ংজ পরাজিত হন এবং দশ সহস্র প্রজাসহ (মতান্তরে সৈন্যসহ) তিনি বন্দী হন। সেই দশ সহস্র প্রজা বা সৈন্যগণকে এংখ্যং বা ইয়ংখ্যং নামক স্থানে বসবাস করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাদের পূর্ববর্তী উপাধি পরিবর্তন করে দাইনাক বা দৈংনাক আখ্যা প্রদান করা হয়। এইভাবেই দৈনাকদের উৎপত্তি হয়েছে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন। আবার চাকমা ঐতিহাসিকগণ উল্লিখিত রাজা ইয়ংজকে চাকমা রাজা বলে অরুণযুগ বলে শনাক্ত করেছেন। ফলে দাইনাক বা দৈংনাকদের চাকমা জাতির একটি অংশ বলে বিশ্বাস করা হয়। আবার দৈংনাক ও তনচংগ্যারা যে একই জাতিগোষ্ঠীর লোক, তাই তনচংগ্যাদেরও চাকমা জাতির অংশ বলে মনে করা হয়। এই তথ্যটি দৈংনাক বা তনচংগ্যা উৎপত্তির পটভূমি হিসেবে বরাবরই চাকমা জাতির ইতিহাস রচয়িতাগণ প্রামাণ্য দলিল বলে চালিয়ে আসছেন। কিন্তু দৈংনাক উৎপত্তির উল্লিখিত অনুরূপ আরো একটি কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায় চাক জাতির উৎপত্তির ক্ষেত্রেও। এ দুটো কাহিনীর অত্যাচার্য মিল দেখে "চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার" গ্রন্থের লেখক অশোক কুমার দেওয়ান তার উক্ত গ্রন্থে (৬৪ পৃষ্ঠায়, প্রথম সংস্করণ) লিখেছেন, "তাহলে দেখা যায় এযাবৎ কাল পর্যন্ত প্রচলিত চাকমা জাতির ইতিহাসের এই অধ্যায়টি চাক জাতিও নিজেদের ইতিহাস বলে দাবি করে। হয়তো এ কারণেই বিরাজমোহন দেওয়ান তাঁর চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত গ্রন্থে চাকরাও চাকমাদের একটি অংশ বলে দাবি করেছেন। তাহলে সাধারণ প্রশ্ন জাগে রাজা ইয়ংজ আসলেই কি চাকমা রাজা অরুণ যুগ? নাকি তিনি দৈংনাক আখ্যাধারীদের রাজা? নাকি আবার চাকদের রাজা ছিলেন তিনি?

রাজা ইয়ংজ যে চাকমা অরুণ যুগ, এর নিশ্চিত প্রমাণের স্বপক্ষে চাকমা ঐতিহাসিকগণ তেমন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ হাজির করতে পেরেছেন বলে মনে হয়না। নতুবা শ্রী অশোক কুমার দেওয়ানকে তাঁর চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার গ্রন্থে আক্ষেপ করে বলতে হতো না, "কাহিনী কি চাকরা আমাদের কাছ থেকে চুরি করে করেছে? নাকি আমরা তাদের কাহিনী আমাদের বলে চালিয়ে দিচ্ছি?"

শ্রী অশোক কুমার দেওয়ান আরো উল্লেখ করেছেন যে, আরাকান ইতিহাসে মেংগদির রাজত্বকালে ১২৭৯ খ্রীঃ থেকে ১৩৮৪ খ্রীঃ পর্যন্ত [অবিশ্বাস্য ভাবে দীর্ঘ ১০৬ বছর) এ মেংগদির সময়েই দেঙ্গ্যাওয়াদির (দৈংনাক) (দান্যাওয়াদু আরেতবুং-আরাকান ইতিহাস] বর্ণিত ১৩৩৩ খ্রীঃ মইচাগিরি (মনিজগিরি) পতনের ঘটনা।

প্রাচীন আরাকান ইতিহাস "দান্যাওয়াদি আরে তবুং" এর মধ্যে দাইনাক (দৈংনাক) শব্দের পরিচয় নিহিত আছে। শব্দগত বিচারে দান্যাওয়াদি ও দাইনাক (দৈংনাক) একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে মনে হয়। দু'টোই বিশেষ্যপদ, যথাক্রমে একটি নামবাচক বিশেষ্য (অঞ্চলের নাম) এবং অপরটি জাতিবাচক বিশেষ্য (জাতির নাম)। নামবাচক (অঞ্চল) বিশেষ্য পদের সাথে জাতিবাচক বিশেষ্য পদের সম্পর্ক চিরকালীন। একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে, সাধারণত: সে অঞ্চলের নামানুসারে সেই জনগোষ্ঠীর নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন - বাংলা ভূখন্ডে যে জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি বা বিকাশ সাধিত হয়েছে, তারা বাঙালি নামে অভিহিত হয়েছেন।

ড. খিন মং নগুনি গি (Dr. Khin Moung Nguni এর) তাঁর "হিস্টোরি অফ মায়ানমার" গ্রন্থে দান্যায়াদি অধ্যায়ে যে তথ্য উপস্থাপনা করেছিলেন, তাতে উল্লেখ আছে দান্যাওয়াদি এবং দাইনাকদের (দৈংনাক) সঙ্গে কপিলাবস্তুর শাক্যবংশের নিবিড় যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থে দান্যাওয়াদি অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২৫ অব্দ থেকে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বর্তমান আরাকান ভূখন্ডে দান্যাওয়াদি তিনটি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম দান্যাওয়াদি যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর নাম মারায়ু। তিনি কপিলাবস্তুর শাক্যবংশীয় রাজপুত্র ছিলেন। কিছু রাজনৈতিক কারণে তিনি তার অনুসারীসহ বর্তমান আরাকান ভূখণ্ডতে গমন করেন। সেখানে তিনি দান্যাওয়াদি নামক একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে এক শক্তিশালী ম্রো প্রধানের কন্যাকে বিয়ে করেন। মারায়ুর পরে তার বংশধর আরো ৫৪ জন রাজা দান্যাওয়াদিতে শাসন করেছিলেন বলে জানা যায়।

দ্বিতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, উচবৃক্ষের তগুং (Tagaung) রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবিরাজা (Abhiraja)র জ্যৈষ্ঠপুত্র কংরাজাগ্রী। কংরাজাগ্রীরা দুইভাই ছিল বলে জানা যায়, আরেক ভাই হল কংরাজাঞ্জী। দুইভাইয়ের যুদ্ধ হয়েছিল, যুদ্ধে কংরাজাগ্রী জয়ী হয় এবং তার অনুসারীরা দ্বিতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে তাঁর বংশীয় ২৮ জন রাজা দান্যাওয়াদি রাজ্য সফল ভাবে এবং দক্ষতার সহিত শাসন করেছিলেন বলে জানা যায়। কংরাজাগ্রী বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করে তৃতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন সুরিয়া (সূর্য) বংশের প্রতিষ্ঠাতা চান্দা সুরিয়া (মতান্তরে চন্দ্র সূর্য)।

তথ্য নির্দেশ- পহর জাঙাল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। পঞ্চম সংখ্যা, সপ্তম বর্ষ (২০০৯)

খ.

কথিত আছে আরাকানে বসবাসকারী চাকমাগণ যাদের আরাকানি লোকেরা দৈংনাক নামে আখ্যায়িত করেন। স্বজাতি চাকমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের কিয়দংশ আরাকান ত্যাগ করে। আনক বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রবেশ করে তারা প্রথমে মাতামুহুরি নদীর অববাহিকায় 'আলে-ক'অ-দ্যয়ং' স্থানের কাছাকাছি তৈনছড়ি নামক স্থানে এক উপনদীতে বসতি স্থাপন করেন। বিশিষ্ট সমাজকর্মী, "চাকমা দর্পণ" নামক গ্রন্থের রচয়িতা প্রয়াত যামিনী রঞ্জন চাকমার মতে, এই আলে-ক'অ-দ্যয়ং শব্দটি মারমা শব্দ। জনশ্রুতিতে আছে এক কালে পাহাড়ের ঢালে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত ছিল, এবং সেখানে শতশত কবুতর বাস করত। সেই কারণে এটার নাম আলে-ক'অ-দ্যয়ং (আলে অর্থ মধ্যবর্তী স্থান, ক'অ অর্থ কবুতর এবং দ্যয়ং অর্থ বাসা। যার পুরোপুরি অর্থ দাঁড়ায় মধ্যবর্তী স্থানে কবুতরের বাসা)। বর্তমানে সেই নামটি আলিকদম হয়ে যায়।

তৈনছড়ি মাতামুহুরির নদীর একটি উপনদী। সেই তৈনছড়ির আশেপাশে তনচংগ্যাদের প্রথম বসতি স্থাপন করে। এভাবে তারা ধীরে ধীরে নাইক্ষ্যংছড়ি, উখিয়া, টেকনাফ ছড়িয়ে পড়ে। কথিত আছে, দৈংনাকেরা চট্টগ্রাম শহরে তৎকালে পর্তুগীজ বণিকদের নিকট থেকে লালকুঠি নামক একটি মনোরম কুঠি বাড়ি ক্রয় করে স্বজাতির রাজা মহারাজ ধরমবক্স খাঁকে উপহার প্রদান করেন। ঐ কুঠিবাড়ী পরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার বাংলো করা হয়। তখন চাকমা জাতি চট্টগ্রামের পূর্বদিকে, কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে রাউজান, রাঙ্গুনিয়া অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর অরণ্যে বসতি স্থাপন করে এবং বিস্তৃত হয়ে পড়েন। তাদের অনুসরণ করে দৈংনাকেরা রাউজান, রাঙ্গুনিয়া অতিক্রম করে রৈস্যাবিলিতে কিয়দংশ ছড়িয়ে পড়েন এবং আর কিছু অংশ কাপ্তাই ওয়াগগা ও চন্দ্রঘোনা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুকাল পর দৈংনাকদের মধ্যে তেরজন বিখ্যাত ব্যক্তি রাজা ধরমবক্স খাঁর সাথে সাক্ষাত করে এবং এতদ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য তালুক এবং তালুকনামা লাভের জ্ঞাপন করেন। তখন তাঁদের মধ্যে ১২ দলপতি এবং একজন মাত্র প্রজা ছিল। তাদের মর্যাদাসূচক পরিচয় পেয়ে রাজা ধরমবক্স খাঁ বেশ দ্বিধায় পড়েন। রায়ত (প্রজা) ছাড়া তালুক হতে পারেনা। কাজেই বারোজন দলপতির জন্য ১ জন প্রজার মধ্যে কিভাবে তালুকনামা প্রদান করা যায়? তাই রাজা পরামর্শ দিলেন সেই ১২ জন দলপতি যদি রায়ত (প্রজা) হতে পারে তবেই তিনি তালুকনাম প্রদান করবেন। সেই ১২ জন দলপতির (আঙু) গোত্র বা নামানুসারে দৈংনাকদের ১২ টি গছা। যা বাংলাদেশে কাররয়া গছা, মো'অ গছা, ধন্যা গছা, মংলা গছা, লাঙ গছা, মেলং গছা, আঙু/অঙ্য গছার লোকের বাস রয়েছে।

দৈংনাকেরা আরাকান ত্যাগ করে আনক বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রবেশ করে প্রথমে মাতামুহুরির অববাহিকা আলে কে'অ দ্যয়ং এর তৈনছড়ির উপনদীর অববাহিকায় সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করে। মহারাজ ধরমবক্স খাঁ তার রাজ সরকারে জুম খাজনা প্রস্তুত করার সময় নবাগত দৈংনাকদের চাকমা নথিভুক্ত করেন নি। রোয়াঙ্গ থেকে প্রথমে আনকে আগমন করে মাতামুহুরির নদী আলে কে'অ দ্যয়ং অঞ্চলে তৈন গাঙে বসবাস করার কারণে তাদের তৈনগাঙ্যা বা তৈনচর্য্যা (তৈনগাঙ বা তৈনছড়িতে বসবাসকারী হিসাবে) নামে জুম খাজনা নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করেন। তৈন গাঙ্যা বা তৈনচার্য্যা নামের ক্রম বিবর্তিত হয়ে তনচংগ্যা / তঞ্চঙ্গ্যা রূপে ধারণ করে।

"শ্রী শ্রী রাজনামা" (চাকমা রাজন্য বর্গ) লেখক শ্রীঃ মাধব চন্দ্র চাকমা।
[পহর জাঙাল/ প্রথম সংখ্যা- ২০০৩ খ্রীঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]
আপনি যত ইতিহাস লোকানোর চেষ্টা করবেন, অস্বীকার করবেন; ইতিহাস ততো জীবিত হয়ে উঠে। মানুষ ততো শেখড় খুঁজবে, এবং ইতিহাস তখনি আপনার আপন হয়ে উঠবে। ইতিহাস কখনো ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না, সময়ের পরিক্রমায় সবকিছু উন্মোচন হয়ে যায়।

লেখক ঃ প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সম্পাদক, চাৈলেন প্রকাশনা পর্ষদ।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি বেদখল ও অধিকার প্রসঙ্গে

- জগদীশ তঞ্চঙ্গ্যা।

আমাদের দেশ বহু মাত্রিকতা, বহু ভাষা-ভাষী, পারস্পরিক ভিন্ন সংস্কৃতির ও নানান বৈচিত্রের দেশ। উক্ত লেখনি "আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি বেদখল ও অধিকার" শিরোনামের প্রসঙ্গে প্রথমে সংজ্ঞায়িত করতে চাই আদিবাসী কারা, ভূমি কি এবং অধিকার কাকে বলে।

আদিবাসী সংজ্ঞাঃ "স্বাধীন দেশসমুহের জাতীগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে" যাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিকও অর্থনৈতিক অবস্থা জাতীয় জনসমষ্টির অন্য অংশ থেকে স্বতন্ত্র এবং যাদের মর্যাদা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রথা কিংবা ঐতিহ্য অথবা বিশেষ আইন বা বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত"।

ভূমিঃ- The State Acquisition and Tenancy Act, ১৯৫০-এর ২(১৬)- ধারা মতে, "ভূমি বলতে আবাদি, অনাবাদি অথবা বছরের যেকোন সময় পানিতে ভরা থাকে এবং ভূমি হতে প্রাপ্ত সুফল, ঘরবাড়ি বা দালান কোঠা বা মাটির সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য অথবা স্থায়ীভাবে সংযুক্ত দ্রব্য এর অন্তর্ভুক্ত বুঝাবে।

অধিকারঃ- "অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তক স্বীকৃত সুযোগ সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে"।

বাংলাদেশে ভূমির মালিকানা প্রচলিত আইনের চেয়ে আদিবাসীদের ভূমি মালিকানার ধরণ আলাদা। তাঁরা তাদের ভূমির মালিকানা লাভ করে থাকে বংশ পরম্পরায় মধ্য দিয়ে।

চলমান প্রেক্ষাপটে আধুনিকতার দীর্ঘ সময়ে আদিবাসীরা হারাচ্ছে তাদের নিজস্ব বাস ও বাসযোগ্য ভূমি আর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার। যে পাহাড় ও বনকে তাঁরা তাদের প্রথাগত কিংবা ঐতিহ্যগত অধিকার হিসেবে দেখতো, তা আধুনিক রাষ্ট্র তাঁদের সাথে কোনো প্রকার বৈঠক বা আলোচনা না করে, সেখান থেকে তাঁদের সরকারি বনায়ন, ন্যাশনাল পার্ক, ইকো পার্ক স্থাপন, টুরিস্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি নামে প্রতিনয়ত উচ্ছেদ করে চলেছে বিভিন্ন অজুহাতে। তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের চিত্রে ১৮৭০ সালের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষনার প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৫ ভাগ ভূমি (১৩৫৬ বর্গমাইল) সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষনা করা হয়। তখন সেখানে ১৩৫৬ (একহাজার তিনশত ছাপ্পান্ন) বর্গমাইল বনভূমি ধ্বংস করে সেগুন নামক এক জাতের বৃক্ষ রোপন করা হয়। এতে করে তখন পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এক অপুরনীয় ক্ষতি সাধিত হয়। যার ফলে তখন সেখানকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা লক্ষ লক্ষ একর উর্বর চাষ ভূমি হারায়। পক্ষান্তরে লক্ষ লক্ষ একর ভূমিতে সেগুন গাছের বাগান গড়ে তোলার কারনে একদিকে যেমন পাহাড়ী জনগোষ্ঠীদের ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল, তেমনি দেশের জন্য পরিবেশগত দিক থেকে হয়েছিল এক বৃহৎ অপুরণীয় ক্ষতিসাধন।

পরে কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (১৯৫৬-১৯৬২) বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নদীর উপর যে বাঁধ নির্মাণ করা হয়, তা ৫৪ হাজার একর পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে ধানী জমি সম্পূর্ণরূপে পানিতে নিমজ্জিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে উচ্ছেদ হয়ে পড়ে ১১ লাখ জুম্ম আদিবাসী। আর এই বাঁধ নির্মানের কারণে জমি জলে নিমজ্জিত হওয়াতে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর বিরাট ধরনের প্রভাব পরে। ফলে তখন ভেঙ্গে পড়ে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড। তখন একদিকে যেমন বস্তুভিটা হারানো অন্যদিকে জমি, সব মিলিয়ে পাহাড়ী আদিবাসীদের এক হাহাকার পরিস্থিতি পরিণত হয়। তাদের জীবনে নেমে আছে এক অভিশাপ।

আদিবাসীদের মধ্যে এই অভিশাপ দু-দিন যেতে না যেতে পরে পুনঃরায় শুরু হয় সেটেলার বাঙালি পুর্নবাসন (১৯৭৯-১৯৮৬) নামে তৎকালীন সরকারের নতুন এক তালবাহানা। সেটি ছিল অনেকটাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সহিংসতার ইঙ্গিত দেয়ার মতো। এই সেটেলার বাঙালি পুর্নবাসন (১৯৭৯-১৯৮৬) মধ্যে দিয়ে ৪(চার) লক্ষাধিক বাঙালী অভিবাসন করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এক ভিন্ন রূপ ধারন করে। ফলে শুরু হয় পাহাড়ী আর বাঙালীদের মধ্যে সহিংসতার সূত্রপাত। তখন সেই সহিংসতার কারনে সেখানেও লক্ষাধিক আদিবাসী উদ্বাস্তু হয়। আর সেই সুযোগে বাঙালী বসতি স্থাপনকারীরা দখল করে নেয় পাহাড়ী আদিবাসীদের ভূমি। এখানে উল্লেখ্য সেটেলার পূর্নবাসনের জন্য সার্কুলারে প্রতিটি সেটেলারের পরিবার প্রতি যে সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তার নিম্নরূপ-

ক্র: নং	একক	জমির পরিমাণ/ টাকার পরিমাণ	জমির ধরণ
১.	প্রতি পরিবার	২.৫ একর	সমতল কৃষি জমি
২.	প্রতি পরিবার	৪ একর	মিশ্র জমি
৩.	প্রতি পরিবার	৫ একর	পাহাড়ী জমি
৪.	প্রতি পরিবার	এককালীন ৫০০ টাকা	মাসিক ২০০ টাকাও ১২সের খাদ্যশস্য

সরকারের প্রথম সভায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) সেটেলার বাঙালী পুর্নবাসনের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সরকার ৮০,০০০ (আশি হাজার) পরিবার কে এই পার্বত্য অঞ্চলে পুর্নবাসন করে। যেখানে তাদের প্রদানকৃত অর্থাৎ আশি হাজার পূর্নবাসিত পরিবারের জমির পরিমাণ হিসাব অনুযায়ী দাঁড়ায়-

ক. কৃষি জমি ২.৫ একর হলে ২০,০০০ একর।

খ. মিশ্র জমি ৪ একর হলে ৩২০,০০০ একর।

গ. পাহাড় জমি ৫ একর হলে ৪০০,০০০ একর।

আর মোট জমির পরিমাণ হয়- ৯২০,০০০ একর।

তথ্যঃ- পার্বত্য এলাকার ভূমি ব্যবস্থাপনায় হেডম্যান এবং কার্বারীদের দায়িত্বও কর্তব্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ। সম্পাদনাও গ্রন্থনাঃ- এএলআরডি (এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)

যেথানে তৎকালীন সরকার কাপ্তাই বাঁধের ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ভূমি প্রদানসহ স্ব-সম্মানে পূর্নবাসন করতে পারেনি সেখানে সেটেলার বাঙালীদের হাজার হাজার একর জুড়ে পূর্নবাসন করা পাহাড়ী-বাঙালী ভূমি বিরোধ সহিংস ঘটনা ও পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন গনহত্যা একটি অন্যতম প্রধান কারন। এসব হাজার হাজার বহিরাগত সেটেলার বাঙালি জুম্ম আদিবাসী জনগনের রেকর্ডীয় বা ভোগদখলীয় বা প্রথাগত ভূমির উপর বসতি স্থাপন করানো মানে জুম্ম জনগনের জায়গা জমি জবরদখল এবং জুম্মদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করানো। যেমনটা এখনো করা হচ্ছে। যার পরিকল্পনা নিজ ভূমিতে তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করে নির্মূলীকরণের নীলনকশা বাস্তকবায়ন করা। যেমনটা হয়েছিল ময়মনসিংহের আদিবাসী অধ্যুষিত শেরপুর, নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, দুর্গাপুর কমলাকান্দা অঞ্চলের আদিবাসীরা। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের শ্বাপদ-সঙ্কুল বরেন্দ্র অঞ্চল বা মধুপুর অঞ্চলের নিরীহ খেটে-খাওয়া শ্রমজীবি আদিবাসীদের জায়গা-জমি, পাহাড়-বন, আবাসস্থল ক্ষমতার জোড়ে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এরা বর্তমানে নিজ বাসভূমিতে একশ্রেণির অসহায় পরবাসীতে পরিণত হয়েছে। এসব জলন্ত ঘটনা এখনো পর্যন্ত ইতিহাস কে কলংকিত করে রেখেছে।আজ অবধি সেই ভূমি থেকে শুরু করে শাসক শ্রেণি কখনো উপজাতি, কখনো ক্ষুদ্র জাতিসত্বা বা কখনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করে চলেছে। এই শব্দগুলো বিশ্লষণে মনে হয় সব উপনিবেশিক ও সংকীর্ণ প্রপঞ্চ ছাড়া কিছুই নয়।কোন জাতির পরিচয় দিতে গিয়ে এসব শব্দগুলি ব্যবহার করা মানে জাতিকে অপমান বা বিলুপ্তি করার প্রয়াস। পৃথিবীর অনেক বড় বড় দেশের সংবিধানে যেমন-আমেরিকা কানাডা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, প্যারাগুয়ে, ইকুয়েডর প্রভৃতি দেশে আদিবাসীদের পরিচয়, অস্থিত্ব, সংস্কৃতি আর অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। মালেশিয়ার আদিবাসী ওরাং আসলি'দের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৫৪ সালে "অ্যাবরিজিনাল পিপল এ্যাক্ট" নামে আইন হয়েছিল। এছাড়াও ফিলিপাইনের মধ্যে রয়েছে আদিবাসী বিষয়ক জাতীয় কমিশন। নরওয়ে, সুইডেন, রাশিয়া ও ফিনল্যান্ডে আদিবাসীদের রয়েছে নিজস্ব পার্লামেন্ট। এশিয়ার মধ্যে ভারত, চীন, জাপান, মালেশিয়া, কম্বোডিয়া, নেপাল, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও লাউসে আদিবাসীরা হয় সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত নতুবা রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইন ও পলিসি দ্বারা স্বীকৃত। ইন্দোনেশিয়ার তাদের তৃতীয় সংশোধনের সময় সাংবিধানিকভাবে আর্টিক্যাল ১৮ আদিবাসীদের অস্তিত্বকে শুধু সম্মান প্রদর্শন করেনি, তাদের নিজস্ব প্রথাগত অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এক সময় নেপালের

সংসদের স্পিকার ছিলেন লিমবু আদিবাসী আর ভারতের স্পীকার ছিলেন মেঘালয়ের একজন গারো আদিবাসী **(সূত্রঃ- ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজিনাস অ্যাফেয়ার্স)**। সেই তুলনায় বাংলাদেশ তথা আমাদের ছোট্ট একটি দেশে সংখ্যালঘুরা কেন এত বঞ্চিত নির্যাতিত, নিপীড়িত অবহেলিত? কখনো ভূমি নিয়ে আন্দোলন, কখনো নিজের স্ব-কীয়তার আত্মপরিচয়ে দাবী নিয়ে, কখনো বা প্রথাগত সংস্কৃতি ঐতিহ্য দাবির আন্দোলনে রাজপথে নামতে হয়। ভূমির অধিকার থেকে শুরু করে তার ব্যক্তিগত কিংবা জাতিগতভাবে আত্মপরিচয়ের অধিকার হচ্ছে মানবাধিকার। এখানে রাষ্ট্র কিংবা কারোর হস্তক্ষেপ করার অধিকার তো থাকার কথা নয়। এদেশের আদিবাসীরা সামষ্টিগতভাবে "আদিবাসী" এবং এককভাবে চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, গারো, পাংখোয়া, খাসিয়া, মনিপুরি, খুমী, আসাম (অহমিয়া), গুর্খা, ম্রো, বম, খিয়াং, চাক ইত্যাদি হিসেবে পরিচয় পেতে চাই। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে অতীতকাল থেকে বর্তমান প্রেক্ষাপটেও আদিবাসীরা যে পরিচয়ে পরিচিতি হতে চাই তার অগ্রাহ্য করা হচ্ছে প্রতিটি পদে পদে। যার ফলে প্রতিনিয়ত শান্তির পরিবর্তে দেখা দিয়েছে একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা, নারীর প্রতি সহিংসতা, সংঘর্ষ নির্যাতনসহ ইত্যাদি নৈরাজ্য ঘটনা। পরিস্থিতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণ করলে অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে, অন্যান্য বড় বড় দেশ গুলো যেখানে সব দিক দিয়ে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার দিতে পারে সেখানে ছোট্ট একটি দেশে আমরা আজ বঞ্চিত, নির্যাতিত আর অবহেলিত। আজো পাহাড়ে মা বোন তাদের অবাধ স্বাধীনতায় চলতে গেলে বাধাগ্রস্থ হয়। কেন ঘরে কিংবা কাজের স্থানে সেটেলার, সেনাবাহিনী বা মানুষরুপি নরপশুরুর দ্বারা নির্যাতনের স্বীকার হয়? তখন ব্যক্তিসত্ত্বা আশাহত হৃদয়ে গুমরে মরে। এসব হীন মনাত্মক বিষয়গুলি প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ আমাদের প্রশ্নবিদ্ধ করে। প্রশ্নবিদ্ধ হয় প্রতিটি সুস্থ বিবেকের কাছে কেন এসব নরপশুদের বিচার হয়না? নিশ্চই তার মাঝে একটু হলেও কিন্তু রয়ে গেছে। আর সেই কিন্তুটা হয়তো কিছু স্বার্থান্বেষী পশুত্ব বিবেক। রাহুল সংস্কৃতায়নে একটা উক্তিতে বলেছেন-"শাসক গৌষ্ঠীর শোভন আচরন শুধু সুবিধা আদায়ের জন্য। সুবিধা আদায় ব্যাহত হলে নিষ্ঠুর আচরন করতে দ্বিধাবোধ করেনা। আজ হয়তো তার কথার প্রতিফলন বর্তমান প্রেক্ষাপট। না হলে কেন আজ বার বার আশাহত হতে হয়। যদি আশাহত করা হবে তবেই কেনই বা মিথ্যা স্বপ্ন দেখাবে এদেশের শাসক গোষ্ঠী? বিষটি হয়তো এমনই হতে পারে নিজের স্বার্থের কারণে মিথ্যা শান্তনা দেওয়া। তবে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের এসব বিষয়ে এগিয়ে আসার সময় আজ প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে। কলংঙ্ক মুছে ফেলার সেই সময় সন্নিকতে। আজ আর যারা এসব মিথ্যাচারীদের পক্ষে ক্ষমতাধর হিসেবে আত্ম অহংকার করেন তাদের বোঝাতে হবে আজ। ইতিহাস ভূলে গেলে

চলবেনা আপনার জাতির রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এই পাহাড়ি রাজপথ। নিজ বাসভূমি থেকে নিজ জ্ঞাতী ভাই বাস্তুহারা। অনেকে নিজ দেশে আজ পরবাসী। এক্ষেত্রে সজাগ থাকতে হবে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম আদিবাসীদের। গড়ে তুলতে হবে অধিকারের ধ্বনি। এক বার নয় বারং বার। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার তাগিদে যাদের নেতিবাচক চিন্তা ধারা রয়েছে মুছে ফেলতে হবে সব। রাষ্ট্রকে বুঝতে হবে তার ভাব ধারা। এদেশের আদিবাসীরা বিচ্ছিন্নতার সাথে নয় বরং তারা তাদের অধিকার নিয়ে সবারই সহযোদ্ধা হতে চাই। চলতে চাই, হাতে হাত রেখে কাধেঁ কাধঁ মিলিয়ে। এতে করে একদিকে যেমন শান্তির বার্তা আনয়ন হবে অন্যদিকে এদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রতা ও নৃ-তাত্ত্বিক বহু মাত্রিকতা অধিকতর বহুগুণে সমৃদ্ধশালী হবে। সুরে, ছন্দে, অলংকারে আর বর্ণাদ্ধ জীবন ধারায় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে এদেশের প্রকৃতি। পরস্পরের মধ্যে বাড়বে সমন্বিত কাজের ক্ষেত্র ও সহযোগীতা। বাড়বে একে অপরের প্রতি আস্থা আর শ্রদ্ধা। সংলাপের দুয়ার হবে সর্বদা উন্মুক্ত। সরকার হবে সম্মানিত।

তথ্য সংগ্রহঃ-

১. পার্বত্য এলাকার ভূমি ব্যবস্থাপনায় হেডম্যান এবং কার্বারীদের দায়িত্বও কর্তব্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ। সম্পাদনাও গ্রন্থনাঃ- এএলআরডি (এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)।
২. ধুধুক। (আন্তজার্তিক আদিবাসী দিবস সংখ্যা-২০১১, সম্পাদক- বাচ্চু চাকমা)।
৩. চাঁলৈন। (তঞ্চঙ্গ্যা শিক্ষা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা, সম্পাদক-তুফান তঞ্চঙ্গ্যা) ।

(লেখকঃ ছাত্র, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, জাতীয় বিশ্বিবদ্যালয়)

চিমুর্জ্যার লক্ষ্মী বর পানা

জুলাই/২০০৩
কথক: অর্জুন কারবারী, মুবাছড়ি
সংগ্রহে: লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

অনেক অনেক আগের দিনের কথা। পাহাড়ের এক গ্রামে চিমুর্জ্যা নামে এক ছেলে। তার বয়স যখন ৭/৮ বছর হয় তখন তার মা-বাবা মারা যান। তার ভাই, বোন, কাকা, কাকি কেউ ছিল না। বেচারা চিমুর্জ্যা নিরুপায় হয়ে পড়ল। তার ছিল সাতজন মামা। তারা সকলে বিয়ে করেছেন এবং একটি ঘরেই থাকে। তাদের আর্থিক অবস্থাও তেমন খারাপ ছিল না। মা-বাবা মারা যাবার পরে, সে মামাদের ঘরে আশ্রয় নেয়। মামারা তাকে গরু চড়ানোর দায়িত্ব দেয়।

একদিন গরু নিয়ে যাবার আগে মামীরা তাকে বাঁসি ভাত ও তরকারী দেয়। বেচারা চিমুর্জ্যা কি করবে, বাঁচতে তো হবেই। ছোট হলেও সে নিজে চিন্তা করল যে, ইহা তার কপালের গুণ। যাই হোক কোন রকম খেয়ে, নিয়ে মন মরা করে গরুগুলো নিয়ে বনে চলে গেল। গরুগুলো মাঠে চড়তে দিয়ে সে একটি গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসল। চিন্তা করছে ক্ষিদেও লেগেছে। সে, ভাবছে, তার মত দুঃখী ছেলে দুনিয়াতে বোধ হয় আর কেউ নাই।

ঠিক সে সময় তার নিকটেই শনি আর লক্ষ্মীর ঝগড়া লেগেছে। শনি বলছে, "আমি বড়" আর লক্ষ্মী বলছে, "আমিই না বড়"। কোন রকম বোঝা পড়াতে আসতে পারল না। শেষ পর্যন্ত তারা উভয়ে শপথ নিল যে, উভয়েই বিচারের খোঁজে বের হবে। বিচার খোঁজতে গিয়ে গ্রামে বা পথে যে লোকটিকে প্রথম সাক্ষাৎ মিলবে তার কাছেই তাদের বিচারের কথা বলবে। আর সে যে বিচার করে দিবে উভয়ে তাই মেনে চলবে।

তারা বিচারের জন্য যেতে যেতে পথে নাগাল পেল চিমুর্জ্যাকে। সে তখন ক্ষুধায় ক্লান্তিতে মৃতপ্রায় হয়ে গাছের গোড়ায় শুইয়ে ঘুমাচ্ছে। শনি, লক্ষ্মী ডেকে বলল, "ঐ যে, গাছের গোড়ায় একটা মানুষ দেখা যাচ্ছে। চল, তার কাছে"। চিমুর্জ্যার কাছে এসে বিচারের কথা বলার জন্য একজনকে একজন পরপস্পর ঠেলাঠেলি করলো। শেষ পর্যন্ত লুক্ষী চিমুর্জ্যাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল। চিমুর্জ্যা ঘুম থেকে বিরক্ত হয়ে জেগে উঠল। তাদেরকে বলল, "কি হয়েছে তোমাদের? এদিকে আমার ক্ষুধায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা"। হাজার ছোট হলেও যেহেতু সত্য করেছে, সুতরাং, তার কাছেই তাদের বিচারের কথা বলল। লুক্ষী খুব নরম করে চিমুর্জ্যাকে তাদের বিচারের কথা বুঝিয়ে বলল, পাশে শনিও বিচারের কথা শুনে আছে।

চিমুর্জ্যা বলল, "কে আর বড় হবে। লুক্ষীকে যেমন, প্রায় সকল লোকে মান্য করে

পূজাও দেয় কিন্তু, শনিকে তো কেহ দেখতেও পারে না, তাহলে লুক্ষ্মীই বড়"। সে কথা শুনে শনির আর কোন কথা বলার সুযোগ থাকে না। কারণদুজনে যে সত্য করেছে, সে হিসেবে তা-ই মেনে নিতে হল। চিমুর্জ্যার বিচার মেনে নিয়ে তারা চলে গেল।

কিছু দূর গিয়ে লুক্ষ্মীর মনে পড়ল, চিমুর্জ্যা যে বিচার করে দিয়েছে এর পরিবর্তে তাকে কিছুই দেয়া হয়নি। সুতরাং, সে আবার চিমুর্জ্যার নিকট এসে তাকে ডেকে বলল, "ও হে, চিমুর্জ্যা তুমি যে আমাদেরকে উপকার করেছো সেজন্যে তো তোমাকে কিছু দিয়ে গেলাম না। তোমাকে আমি একটা কথা বলি, ঐ সাগর দিয়ে যেসব জাহাজ আসা-যাওয়া করে তোমার নিকটে আসলে তুমি বলবে যে, ও মা লক্ষ্মী, স্বরসর্তী, নিন্দ্রানী, অলুক্ষ্মী আমায় দিবা বর, ঐ জাহাজটা ঐখানে বন্ধ হয়ে থাকার মত কর। তখন জাহাজটি বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর তারা যাই করবে করোক, তুমি ছাড়া কেহ সাড়াতে পারবে না। তুমি সাড়িয়ে দেয়ার পরে তোমাকে বহুত বহুত পুরস্কার দিয়ে যাবে।" এ কথা বলে লুক্ষ্মী চলে গেল।

তারপরের দিন চিমুর্জ্যা মা লুক্ষ্মীর কথা স্মরণ করে সাগরের কিনারে গরু চড়াতে গেছে। গরু গুলো মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে ভাল দেখে একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে। যখন প্রায় দুপুর হচ্ছে সে মুহূর্তে সে দেখল যে, বিরাট একটা জাহাজ তার দিকে আসতেছে। সে মনে মনে খুশী হল যে, মা লুক্ষ্মীর শিখিয়ে দেয়া মন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। কিছুক্ষণ পর জাহাজটা একদম নিকটেই আসল। চিমুর্জ্যা সুযোগ বুঝে তার মন্ত্রটা "ও মা লুক্ষ্মী, স্বরসর্তী, নিন্দ্রানী, অলুক্ষ্মী মরে দিবা বর। এই জাহাজটা এখানে থাকে মতো কর"।

আর কী? সত্যি সত্যি জাহাজটা ঘুরু-রুরুং করে শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।
এদিকে চিমুর্জ্যার অন্তর মন কাঁদছে। কি, করলাম, কী হয়? মনে মনে ভয়ও পাচ্ছে। সে যে কিছু জানে না মতো করে জাহাজের দিকে একটু একটু করে চোখ দিয়ে তার গরুগুলো একবার এদিক থেকে ওদিকে আরেকবার ওদিক থেকে এদিকে নিয়ে এসে সময় কাটাচ্ছে।

জাহাজটা বন্ধ হবার ছাড়বার জন্য বহুত চেষ্টা করল কিন্তু, কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত একজন গণক নিয়ে এসে গণনা করে দেখলো। সেই গণক বারবার দেখতেছে, পার্শ্ববতী এক রাখাল বালক ছাড়া আর কেহই জাহাজটাকে ছাড়াতে পারবে না। গণক সওদাগরকে সে কথা বুঝিয়ে বলল। সওদাগর আর দেরী না করে তার লোকজনকে আদেশ করল, আগে আগে যে রাখাল বালক পাওয়া যায় তাকেই ধরে নিয়ে আসতে। সওদাগরের লোকজন জাহাজ থেকে নেমে কেবল মাত্র পেল চিমুর্জ্যাকে। তাকে জাহাজে ডেকে নিয়ে তার সাথে খুব নম্র ব্যবহার

করে, ভাল ভাল খাবার দিল, পরে সওদাগর নিজে এসে বলল, জাহাজটা সারিয়ে দেবার মত কোন উপায় সে জানে কি না, চিমুর্জ্যা মা-লক্ষ্মী মা বলে দেয়া কথা গুলো মনে তুলল। সে বলল যে আগে তাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিতে হবে। তারপরেই জাহাজটা সেড়ে যাবে। সওদাগর বলল, চিমুর্জ্যাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবার জন্য। চিমুর্জ্যাকে জাহাজ থেকে কুলে নামিয়ে দেয়া হলো। চিমুর্জ্যা কূলে এসে জাহাজের দিকে নিজের ডান হাতটা তুলে বলল, "ও মা লক্ষ্মী, স্বরসতী, নিন্দ্রানী, অলক্ষ্মী আমায় দিবা বর, এই বন্ধ হয়ে যাওয়া জাহাজটা বেশ কিছু দুর এগিয়ে গেল জাহাজটা। সওদাগরের মনে উঠল যে, জাহাজটা সাড়ানোর জন্য ঐ ছেলেটা যে উপকার করল, তাকে তো কিছু দেয়া হলো না। সুতরাং, জাহাজটা ঘুরিয়ে নিয়ে এসে চিমুর্জ্যাকে ডেকে বলল, "ওহে চিমুর্জ্যা, তুমি আমাকে যে উপকার করেছো, সেই বদলে তোমাকে কিছু না দিয়ে যাচ্ছি যে, এই লও এই কাপড়টা। কাপড়টা ধরলে একমুঠ আর খুললে বিরাট হবে। ইহা তোমার কাজে লাগবে"। এই বলে চিমুর্জ্যাকে কাপড়টা দিয়ে সওদাগর জাহাজটা নিয়ে চলে গেল।

চিমুর্জ্যা কাপড়টা নিয়ে পেশিয়ে একদম ছোট করে কানের খোলে বরিয়ে এনে গোয়াল ঘরের এককোণে কেউ না দেখে মতো লুকিয়ে রাখল। চিমুর্জ্যা তারপরের দিনগরু চড়াতে যায়। গরু নিয়ে ফিরে দেখে যে, তার লুকিয়ে রাখা কাপড়টি নাই। হয়তো বা তার কোন মামী গোয়াল ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে কাপড়টি কোদালে লেগে পড়ে যায়। বেচারা এখন অসহায়। কেমনে সেই কাপড়টি তার বলে দাবী করবে? পরে গভীর চিন্তা করে তার সাত মামীদের লক্ষ্মীর দেয়া মন্ত্র দিয়ে একজনকে এক একটা কাজ লাগিয়ে দেয়। সাতদিন পর্যন্ত মামীরা যার কাজ সে করছে তো করছেই সন্তান- আর স্বামীদের পর্যন্ত খবর নেয়ার সময় নেই। ভাত-পানি খাওয়া নাই, ঘুম-বিশ্রাম নাই, কারোর সাথে কোন কথা-বার্তা নাই, যে পানি তুলছে গজি-হাড়ি-পাতিল পূর্ণ হয়ে গেলেও পানি তুলছে, যে ভাত রাধঁছে খাওয়ার লোক না থাকলেও রাধঁছে। যে মুরগীদের খাবার দিচ্ছে সে দিচ্ছে। এভাবে একদিন গেল, দু'দিন গেল তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। মামারা খুব চিন্তায় পড়ল। তারা একটা ভাল গণক বৈদ্য ডেকে নিয়ে আসল।

যে গণক বৈদ্যকে তারা নিয়ে আসল, সেই বৈদ্যের স্ত্রীও খামাকা বৈদ্যের সাথে আসতে চায়। কিন্তু দু'চোখ কানা হাটতে পারে না। সুতরাং, বৈদ্যকে পিঠে করে তার স্ত্রীকে নিয়ে আসতে হয়েছে। চিমুর্জ্যা তা দেখে গণক বৈদ্যের স্ত্রীকে তার পিঠে লাগিয়ে দিল। বৈদ্য স্ত্রীকে পিঠে করে নিয়ে দেখল যে, সাত ভাইয়ের ঘরে যে একজন রাখাল আছে সেগুরুর ঘরের কিনারে একটা কাপড়া লুকিয়ে রেখেছে। তাদের এক ভাইয়ের বউয়ে সেই কাপড়টা পেয়েছে এবং তা কোমরে বেঁধে রেখেছে।

সেই কাপড়টা ছেলেটাকে না দেয়া পর্যন্ত এ-অবস্থা বদলাবে না। আর আমিও আমার স্ত্রীকে নিয়ে একই রকম ফাঁদে পড়ে আছি। হায়রে ভগবান! যত তাড়াতাড়ি পার যার কাপড় তাকে দিয়ে দাও গে।

গণক বৈদ্যের কথা শুনে সাত ভাইয়ে কাপড়টা খুঁজে দেখল। কার বউ এর কাছে কাপড়টা আছে। সাতটা বউ এর কোন খাবার ছাড়া, ঘুম ছাড়া অবিরাম কাজ করতে করতে একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। মেঝ বউ এর কাছ থেকে কাপড়টা পাওয়া গেল। কাপড়টা পেয়ে চিমুর্জ্যাকে ডেকে সাত ভাইয়ে চিমুর্জ্যা থেকে ক্ষমা চাইল। কাপড়টা তাকে দিল। সাত ভাইয়ে বুঝল, যখন চিমুর্জ্যা তার মামীদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তি দিল। আর সংগে সংগে বৈদ্যয়ার পিঠ থেকে তার স্ত্রীকে ছাড়িয়ে দিল। সবাই আশ্চর্য হল এবং বুঝল যে, ছোট হলেও বেচারা চিমুর্জ্যার কাছে কিছু গুণ আছে। সুতরাং এরপর থেকে তাকে খুব আদর যত্ন করতো। কাজ-তাজ দিলেও তার মনে কষ্ট লাগে এমন ব্যবহার করতো না।

একদিন চিমুর্জ্যা গরু নিয়ে উত্তরের পাহাড়ে যায়। গরুগুলো মাটে চড়তে দিয়ে চিমুর্জ্যা সুবিধা মত এক জায়গায় বিশ্রামে আছে। ঠিক দুপুর বেলা হঠাৎ করে আকাশটা কালোমেঘে চেয়ে গেল। যেন এখনিই বৃষ্টি হবে। সেখানে পাহাড়-পর্বত ছিল একটা রাক্ষুসী সাপ। নাম হল মুনিরাজ সর্প। সেই সাপটা আসতেছে চিমুর্জ্যার দিকে। মুখটা বিরাট হা করে। যেন এখনই চিমুর্জ্যাকে গিলে খাবে। চিমুর্জ্যাও কম বাপের পুত নয়। সে একটুও ভয় করল না সাপটাকে। সে মন্ত্র দিলো সাপটাকে। সে মন্ত্র দিয়ে সাপটাকে হাঁ-মুখ অবস্থায় এক জায়গায় বন্ধী করে রেখেছে। সাপটা আর নড়াচড়া করতে পারল না। এ অবস্থায় তার হা-মুখে বাতাসে কত লতা, পাতা-গাছের টুকড়া ঢুকতে লাগল।

মুনিরাজ বুঝল, চিমুর্জ্যার কাছে সে অপরাধী, তাই সে চিমুর্জ্যাকে ডেকে বললো, “ও চিমুর্জ্যা আমার কথা শুন, আমি তোমাকে কিছু করবো না। তোমাকে আক্রমণ করতে এসে আমার ভুল হয়েছে। আমি মাফ চাই, ক্ষমা চাই। আমাকে ছেড়ে দাও। মুক্ত করে দাও। তার বদলে আমি তোমাকে আমার লেজের আগায় “ম-মঙ্গ” আংটিটা তোমাকে দেব। সেটার সাহায্যে তুমি যা চাও, তাই- পাবে। যেখানে যেতেইচ্ছা করে। সেখানে যেতে পারবে। যাকে বলে সুখী হতে পারবে”। চিমুর্জ্যা বলল, “কই, আগে দাও আমায় আংটি, তারপরে বলো চাও কী”? মনিরাজতার লেজটা এ ঝাকানি দিলে তার লেজের আগা থেকে তার “ম-মঙ্গ” আংটিটা খুলে গেল। তারপরে চিমুর্জ্যা গুরি গুরি বৃষ্টি-বাতাস ও হালকা ভূমিকম্প হয়ে গেল। তারপরে বিকেলের আকাশ পরিস্কার। বিকেলের সোনালী রোদের আভায় সবুজ প্রকৃতি যেন ঝলমল করছে। চিমুর্জ্যার এখন যাকে বলে ভাল লাগছে। মা লক্ষ্মীর বর পেয়ে সে গুরুতর বিপদ থেকে বাচঁল আর জীবনে যাহা আশা করা যায় না এমন একটা জিনিস পেল। “ম-মঙ্গ” আংটিটা নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের নানা কিছু চিন্তা করছে।

---- সমাপ্ত----

মাতৃভাষায় কবিতা

মং বাজিবের

- মৃত্তিকা চাকমা

অক্কয়ান হিঝি এযের
রোদ ঝর আন্দার পহর
ইয়োর ওই কদ খেব
দেরী নেই মং বাজিবের।
সরান অভ' চুধোহাত্তি
ধাগে পাদাজ্যে নেই-
আভর খেবার অহরানত থক-
যদি ন পায় তে, পদ কাজেই নিজেন।
কোজেই এযের মং বাজিবের।
দের-দেনে বাঙে আহধে আঙুলে
ইহধে চোগে মুয়ে নাগে কানে
বানা দেনাত, মহ নয়-
ফেইয়ে চুধো, চেব তে
ঘনাত মং বাজিবের।

লেখক : কবি ও সাহিত্যিক
শিক্ষক, মনোঘর আবাসিক বিদ্যালয়
রাঙ্গামাটি।

নিজ-অ আঘ্ সি-ই

- সতিশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

আইস-অ বাপ-ভাই
মা-বোইন লক
আমা লেয়া সি-ই,
সালামী পাঠ পড়া যি-
বাক্কুনে মিলি।
এক সমারে পড়িবং আইস
আমা লেয়া-উন,
ই- দেসত জিদুক্কান আহি
তঞ্চঙ্গ্যা গছাউন।
পর-অ মা-আ বা গম উলেয়
নিজ-অ মা-আ দক নয়,
আমা মা-ভাসান-অ সি-ই লে আমি
কেনে দিবং পরিসয়।
সুগর কদা দুগর কদা
লি-ই বং আমা ভাসায়,
সালামী পাঠ পড়া যি-
আইস-অ বাক্কুনে।
আমা লেয়া-ই আমা ভাসায়
মন-অ কদা লি-ই,
আইস-অ বাপ-ভাই
মা-বোইন লক
নিজ-অ আঘ্ সি-ই।

লেখক : তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা প্রশিক্ষক।

জুম্মাবি

- কে. শুদ্ধোধন তঞ্চঙ্গ্যা

জুম্মাবি আগে দক্ক্যা নাই
বুত বদলি গিয়ে গোই,
যে জুম্মাবি আগে কালাং বুগি
তাগল আরত জুমত যায়,
সে জুম্মাবি ইক্কুনু বোরকা পিনি নাই
শপিং মলত শপিং গোইবা যায়।
জুম্মাবি আগে দক্ক্যা নাই
বুত বদলি গিয়ে গোই,
যে জুম্মাবি আগে চিরল পুই নাই
আম কবা খঅয়,
সে জুম্মাবি ইক্কুনু চিরল বাইত পালে
মুঅত রুমাল দাগি তাই।
জুম্মাবি আগে দক্ক্যা নাই
বুত বদলি গিয়ে গোই,
যে জুম্মাবি আগে সমাজ কামত
পেরোন খারি মারা কবং পিনি নাই যায়
সে জুম্মাবি ইক্কুনু বোরকা সারা
ঘঅ-তুন নিগি ন-পায়।
জুম্মাবি আগে দক্ক্যা নাই
বুত বদলি গিয়ে গোই,
সে জুম্মাবি আগে দেশ জাতর
রাজনীতি কম্বা গম পায়,
সে জুম্মাবি ইক্কুনু দেশ জাতর
রাজনীতি কুলে উল্লা কামাইবা তোগায়
জুম্মাবি আগে দুক্ক্যা নাই
বুত বদলি গিয়ে গোই,
যে জুম্মাবি আগে কঠিন চীবর
দানত সংঘরে চীবর দানদে,

লেখক : বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি
তঞ্চঙ্গ্যা সংবাদ অনুবাদক ও পাঠক

মু-অত মিরা পেরত তিরা

- বিপুল তঞ্চঙ্গ্যা

আমা রোয়াত্ গুজ্যাবী
রুবে রঙে লুক্ষীমা কেরা ফল,
করানি কুবরে মিরা মিরা
মনান তার বিত তিরা।
মানুইত বুশি করা কয়
সুযোগে পেলে গিলি লয়।
আঙুল গুরে পরেয়া ভুলানি তে-দেগেদে
নি-জ বেলাত কিচ্ছু তে-ন-দেগে,
করায় করায় নীতি দেগায়
নি-জ বেলায় মু-লুগে থায়।
ভুল গুল্যে অয়ফা কয়,
তা বেলায় কিচ্ছু নয়।
মাইনস্য দুস্যানি তে দেগে
তা-দুস্যানি নত্দেগে
ইত্তায় কুব এক করা
উত্তায় কুব-উ-করা
মুসঙত উলে গম গম করা।
খে-পেলে জ্ঞাতী ভাবে
খে-ন-পেলে শত্রু ভাবে।
ঘোয়ে ঘোয়ে ঝামেলা বাসেদি
সাধু হেল্যায় মুত্যেদি।
টেঙা পোইসা লুব দিগিলে
ভাইল দি-ব নিত্ত শালে।
ম-ন আশা পু-এ-লে
দুগত ফিল্যে তাই শালে।

দইত জনত দস্যান করাত
জ্ঞানী হেল্যায় বে-আ-গ মারাত।
দইত জ-ন করানিদাম নাই
তা-করানি দাম তাই।
দইত জ-ন মুসঙত গম হেল্যার
সুযোগে পেলে দুগত ফেলায়।
ধর্ম কর্ম সমাজত
জ্ঞানী হেল্যায় জিয়ত সিয়ত,
ধর্ম কর্ম বেগ বুশে
মানুস্যানি-এ নিও হুরে।
মু-এ-মু-এ গমান বেগ
পে-র ভিরে জিলাবী পেচ।

লেখক : ফারুয়া, এগুজ্যাছড়ি।

রাইখ্যং গাঙআন্

- নিরুপনা তঞ্চঙ্গ্যা

আমা-ই রাইখ্যাং গাঙ-আন
চারে ভারি গম লাগে,
রাইখ্যাং গাঙান্-অ কায় আমি
ডাঙ-অ উয়ি চিগুন্‌নত্তুন ধুরি।

রাইখ্যাং গাঙ-আন উলরে বেঙা-বিক্ক্যা
তা দি-পাশে আগে গ-অ আ গাইত,
রাইখ্যাং গাঙ-আ-নত পানিবই যাই
সারা বছ-অ ধুই।
রাইখ্যাং গাঙ-আ-নত থেবং আমি,
সারা জনমান ধুই।

লেখক : ছাত্রী, বিবিএস প্রথম বর্ষ
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

ই দিনত কন্না কুবহ্

- জ্যাকসন তঞ্চঙ্গ্যা

ই দিনত কন্না কুবহ্
কা দুঃঅ কধা॥
বেয়াক্কুনেদহ্ দুঃখেয়া মানাই,
আইসহ্ ধরাধরি গুরিনে হাঁধি
বেয়াক্কুনে মিলিনে॥

দুঃঅ কধা খুলি কুবার যি লক্ষে যাবে তুই
সিক্তুনহ্ বেইচ দুঃঅ কধা তুই শুনি পাবে॥
কারে শুনাবে?
কারে বুচাবে?
আর কা কধা শুনিবে?
কা কধা বুচিবে?
আইসহ্ না ভাই বোন লক
নিজহ্ কামান সালেহ্ নিজে গুরি।

লেখক : অনার্স ১ম বর্ষ (উদ্ভিদ বিভাগ)
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ

জাগি উড়ি বার-অ গছা তঞ্চঙ্গ্যা উন

- শান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

আইস-অ বার-অ গছা তঞ্চঙ্গ্যা ভাই উন,
আইস-অ বার-অ গছা তঞ্চঙ্গ্যা বোইন উন,
বেয়াক্কুনে আমি আরে আত দঅই নায় জাগি উড়ি।
জাগি তুলি আমা তঞ্চঙ্গ্যা জাত-অরে,
কোনো দিন পোই নঅ ফেলায় বং আমা এই তঞ্চঙ্গ্যা জাত-অরে।
পোই নঅ ফেলায় বং আমা বুদ্ধ ধর্ম আন,
কোনো দিন ন-অ গোইবং আমি কু কাম।
বেয়াক্কুনে মিলিনাই গোইবং আমি গম কাম,
জাগি তুলি বং আমা তঞ্চঙ্গ্যা জার-অ মানুষ্যুন
বেয়াক্কুনে আমি অবং স্বশিক্ষায়-শিক্ষিত,
জাগি তুলি বং আমা তঞ্চঙ্গ্যা জার-অ নাঙান।
পোই নঅ ফেলায় বং আমা তঞ্চঙ্গ্যা কঅরা
পোই নঅ ফেলায় বং আমা তঞ্চঙ্গ্যার সংস্কৃতি ঐতিহ্য পেশা,
ইয়ান মনত তোয় নাই আমি বানাই বং আমা তঞ্চঙ্গ্যা জাত্তোয়া দুনিয়া দাঙবা।

লেখক : ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী
বিলাইছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

মৃত্যু

- সুজন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

এ দুনিয়ায় কত মানুষের মহা সমাগম,
লক্ষ কোটি হাজার হাজার,
তাহারই আদরের সহিত খোদা
পাঠাইছে এ ভূবনে করাইতে বাজায়।
এ পৃথিবী এক রঙ্গমেলার
কয়েক দিনের ছলনায় মিথ্যে খেলায়,
এ খেলা ভাঙবে যেদিন
মানব তোমার জীবনের সমাপ্তি বেলার।
হে মানব! খোদা তোমারে দিবে ডাক-
সে কথা জান কি তুমি?
তখন তোমায় ছাড়িতে হবে মাতা-পিতা,
ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন জন্ম ভূমি।
বুকের বন্দি খাচায় থাকবেনা আর বন পাখি-
অনন্ত নিদ্রা আসিবে চোখে,
মাটির মূর্তির মত নির্জীব থাকবি শুয়ে
কোন কথা থাকবেনা মুখে।
তোমার শোকে করুণ সুরে
কান্দিবে তোমার মা-বাপ, ভাই-বোন,
শেষ দেখা দেখিতে আসিবে
আরো কত পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন,
গোসল করাবে তোমায়
সাবান মেখে নিম পাতার গরম জলে,
সবাই কান্দিবে তখন-
অশ্রুসিক্ত ঐ চোখের জলে।

চারজনে কাঁধে করে নিয়ে যাবে তোমায়
কয়েকজনা জীবিত মানব প্রাণ,
সঙ্গে থাকিবে আরো মহামান্য যাত্রী
মুখে থাকিবে শেষ বিদায়ের গান।
তাহার পরে মাটির পালঙ্কে
বড় যত্ন করে শোয়াইবে তোমায়,
যে ফুলহীন অন্ধ বাসরে থাকিতে হইবে একা।
বীরবেগে বলিব আমি, লিখিবো মোর কল্পনার কালিতে
এ ধরনী বিধির গড়া সুখ-দুঃখের হাসি-কান্নার,
সুখের স্বপ্ন দেখার মিথ্যে বাজার॥

লেখক : ছাত্র, বি.এস.এস (৩য় বর্ষ), রাঙ্গুনিয়া কলেজ
গাছকাটাছড়া, বিলাইছড়ি।

জমিদার

- সুপন তঞ্চঙ্গ্যা

জমিদার আজ ভীষণ রাগান্বিত,
চোখ লাল করিয়া, বসিয়াছেন বিচার সভায়।
উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন,
কোথায় সে বালক তাহার মুখখানি দেখিতে চাই।
কেমনে সাহস করিল সে নির্বোধ,
আমার বাগান হইতে নারিকেল চুরি করে।
কিছুক্ষণ পর দেখিলো সবাই,
কাঁপিতে কাঁপিতে আসিতেছে বালক জমিদারের দ্বারে।
জমিদার হুকুম দিলেন তাহার জল্লাদেরে,
হাতখানা কাটিয়া দেহ হইতে আলাদা করিয়া দাও।
উপস্থিত সবার চোখ কপালে উঠিল বটে,
নির্বোধ ছোট বালক এমন শাস্তি কি তাহার প্রাপ্য।
আর কত হইবে বালকের বয়স,
আন্দাজ করিয়া বলা যায় তের কি চৌদ্দ।
জমিদারের ভয়ে কেউ কিছু কহিল না,
নির্বোধ বালক উচ্চস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল।
সাধারণ প্রজাগণ মনে মনে ভাবিয়া উতলা,
এ কেমন বিচার করিল জমিদার।
মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু কহিতে পারিল না,
নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিল জমিদারের বিচার।
আর কত কাল ধরিয়া কত দেশ জুড়িয়া,
এমন পাষান্ড লোকের হইবে উদ্ভব।
তাহার বেলায় সাত খুন মাফ হইয়া যায়,
তাহার পক্ষে কিনা করিতে অসম্ভব।
কত আর করিবে অন্যায় আবদার,
কতই আর করিবে শোষণ।
একদিন না একদিন পাইবে সাজা,
রুখিয়া দাড়াইবে নিরীহ জনগণ।

লেখক : অনার্স (৪র্থ বর্ষ)
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

অতঃপর প্রতীক্ষায় ....

- ফাঁড়া বাইত

খুঁজিতে গিয়ে হিজল ফুল
হারিয়া গিয়াছি বনে,
মনের আকাশ কালো হইয়াছে
তোমারি পড়িয়া মনে।
রিমঝিম করিয়া বৃষ্টি পড়িল
ফুটিল কদম ফুল,
ফুলের গন্ধে ভরিয়া গিয়াছে
বনের দু'কুল।
এপাড় ঐপাড় খুঁজিলাম পথ
পায়নি কোনো সাড়া,
হারাইলাম আমি আমায় আমিকে
হইয়াছি সর্বহারা।
তমালের নিচে বসিয়া আছি
আকাশের পানে চেয়ে,
মনে পড়িল তোমারি কথা
রিমঝিম বৃষ্টি পেয়ে।
লিখিলাম তোমার হিজল পত্রে
ভাসিয়া দিলাম গাঙে,
পত্রখানি চেয়ে নিও
গাঙ হতে মোর নামে।
মনের কথা লিখিও প্রিয়
লিখিও মনের ভাষায়,
সারাটি জীবন থাকিবো আমি
তোমারি প্রতিক্ষায়।

লেখক : ছাত্র, ৩য় বর্ষ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এগিয়ে চল

- ইনিতা চাকমা

চললে ভাই চল চল
সামনে সবাই এগিয়ে চল
হিংসা বিদ্বেষ সব ভূলে
নতুন করে স্বপ্ন দেখি চল।
পথে থাকুক কাঁটা,
মানবো না কোন বাঁধা
দুঃসাহসী অভিযানে চালিয়ে নাও দু'পা,
তরুন জোয়ান আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা
সবাই চলো, একসাথে
আসুক পথে দৈত্য দানব
তুচ্ছ করে এগিয়ে চলো সামনে
এসো তরুন জোয়ান আর নবীন নারীর দল
এক সাথে সবাই এগিয়ে চল।
লাশের পর লাশ পড়বে জানি
লাল রক্তে ভিজে যাবে মাটি
নদীর জলে মিশে গড়িয়ে যাবে রক্তের নালী।
তবু আমরা পিছু হাটবো না
সব বাঁধা পেড়িয়ে এগিয়ে যাবো
বুকে সাহস রেখে এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো
একদিন আমরা সফল হবো
মাথা উঁচু করে পাহাড়ে দাড়িয়ে
নতুন করে পৃথিবীটা দেখবো।

লেখক : ইনিতা চাকমা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কবিতার প্রেম

- সুদীপ্তা তঞ্চঙ্গ্যা

এই তো প্রেম কবিতার প্রতি,
কবি আর কবিতা চয়নী।
কলম আর কালিতে সাদা কাগজের সঙ্গমে;
শব্দ যোগান দেয় প্রেম হয়ে।
কবিতার দর্শনে ফুটে থাকে প্রেমের
অনবদ্য ফুল,
স্মৃতি আর সৌন্দর্য্যে হয়েছে অমলিন।
কবির সুরে গেঁথে থাকে কত কল্পিতা,
এযেন মার্ধূয্যময় প্রাকৃতিক রূপমা।
ভালোবাসি তোমায় আরও ভাসি
তোমার- ছন্দাছন্দী
সেই মুগ্ধ মহিমায় প্রেয়সিনী হয়েছি আমি

লেখক : রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ

জীবনের দৃশ্যপট

- শিউলি তঞ্চঙ্গ্যা

জীবন যেনএক শুভ্র কাঁশফুল,
যার পরশে আমরা বিমোহিত হই।
জীবন কখনো যেন ভেসে বেড়ানো মেঘ,
যা মনের সংকীর্ণতাগুলোকে দূরীভূত করে দেয়।
জীবন কখনো যেন আঁকাবাঁকা মেঠো পথ,
যার গন্তব্য আসলে সত্যিই জানা নেই।
জীবন কখনো যেন সাজানো বালুচরের ঘর,
যখনি ঢেউয়ের তোড়ে হয়ে যায় তছনছ।
জীবন কখনো আবার লাল-নীল প্রজাপতি,
যেখানে রয়েছে অবাধ স্বাধীনতা আর খুনসুটি।
জীবন মাঝে মাঝে আবার কল্পনার চেয়েও বেশি,
স্বপ্ন উঁকি দিয়ে যখনি দেয় ফাঁকি।
জীবন কখনো আবার বহমান নদীর মত,
খুশির জোয়ারে যখনি ভাসি অবিরত।
জীবন কখনো আবার রূপকথার খেলাঘর,
শেষ নিঃশ্বাসে যখনি ভাবি সবিইতো পর।
তাই, ভাবি জীবন যেনএক গন্তব্যহীন পথ,
যখনি দেখি জীবনের এই দৃশ্যপট।

লেখক : ডিগ্রী ২য় বর্ষ, কর্ণফুলি ডিগ্রী কলেজ, হরিনছড়া, কাপ্তাই।

ভয় হয়

- অলনা তঞ্চঙ্গ্যা

কত দিন হলো আমার গ্রাম দেখি না
দেখি না আমার সেই ভাঙ্গা মাচাং ঘর
হাসপাতালের বিচ্ছিন্ন রুমের চার দেওয়ালে বন্দী আমি
হে শাসনকর্তা, শুনছো কি আমার কান্না!

এখন ভয় হয়, দেখতে আকাশ আর প্রকৃতি
বাইরে বেরোলেই মানুষরূপী হায়েনার প্রতিকৃতি।
ওরা কেড়ে নিলো আমার সম্ভ্রম, রক্ষা হয়নি শরীর,
সত্যিই কি এরা সুশিক্ষিত মানুষের বাচ্চা!

চোখ বুজে পরে আছি জীবন্ত লাশ হয়ে
হয়তো আমার আরও কোনো মা-বোনের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ,
পরে রয়েছে শহরের বাক্সে
সে অর্ধগলিত বিচ্ছিন্ন শরীর খাচ্ছে কাঁক আর শিয়ালে।

ভয় হয়, এ বুঝি আবার করে ফেলবে গুম
সত্য কথা বললে করে ফেলবে খুন।
শহরের অলিতে-গলিতে বা ঝোপেঝাঁড়ে থাকা কোনো নারীর লাশ
গলে পচেঁ থাকা সে আর্তনাদ,

আমরা আর দেখতে চাইনা, শুনতে চাই না
আমরা বাঁচতে চাই, আমাদের বাঁচতে দাও
বন্ধ করো নারী নির্যাতন, হত্যা ধর্ষণ
নয়তো এ পবিত্র ভূমিতেই হবে তোমাদের পতন।

লেখক : রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতি

- মিতালী তঞ্চঙ্গ্যা

তোমায় নিয়ে গর্ব আমার
তুমি আমার অহংকার।
তোমার জন্য বেঁচে আছি
কারণতুমি অস্তিত্ব আমার।

তোমার নাম নিয়ে বেঁচে আছি
সমস্ত তঞ্চঙ্গ্যা জাতি।
তুমিই আমাদের ঐতিহ্য
তাই তোমায় ভালোবাসি।

তোমার জন্য-শ্রদ্ধা-ভক্তি
করি আরো প্রার্থনা
তঞ্চঙ্গ্যা-জাতি যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়
স্বীকার করবেনা পরাধীনতা।

সকলে মরবো এক সাথে
করবোনা কাউকে হিংসা
আমাদের মাঝে হিংসা নেই
ভুলে গেছ নাকি আমরা তঞ্চঙ্গ্যা।

লেখক : অনার্স ১ম বর্ষ
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

সংস্কৃতি

- সোহেল তঞ্চঙ্গ্যা

সংস্কৃতি হলো মানব জীবন
বড় অহংকার,
সংস্কৃতি হলো মানব জীবনের
নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ।
সংস্কৃতি হলো মানব জীবনের
নিজের জাতির পরিচয়,
সংস্কৃতি হলো মানব জীবনের
নিজের ঐতিহ্যর সাথে পরিচয়।
সংস্কৃতি হলো মানব জীবনের
নিজের ভাষার সাথে পরিচয়।
সংস্কৃতি হলো মানব জীবনের
নিজের মায়ের সাথে পরিচয়।
সংস্কৃতি হলো মানব জীবনের
নিজের আত্মপরিচয়।

লেখক : বি.বি.এস ১ম বর্ষ
রাঙ্গুনিয়া কলেজ

শব্দ জাল

- সতী দেবী তঞ্চঙ্গ্যা

আমি একটু একটু করে অজানা
শব্দের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি।
সব অপরিচিত যেন পরিচয়ের গভীরে
লুকিয়ে খেলছে অবিরত আমায় নিয়ে।
এই জগতে অসম্ভব- বলতে কিছু হয় না,
তাই বলে কেন সব কিছু ধোঁয়াশা হয়ে চলছে।
জানতে চাইছি না,
জেনে ইচ্ছা বা কি?
এক পরিণয়ে হাজারো কষ্টের সম্মুখীন হওয়া খুব সহজ নয়
দ্বিতীয় পরিণয়ে চাই না হেরে যেতে শব্দের প্রতি পদ জুড়ে॥
আটকে পড়েছি, শব্দের মায়ায়, তার গভীরতায়,
কিছু প্রচ্ছদ বিবরনীতে।
অবাক লাগে, ভাবতে সংকীর্ণ
এই সময়ে কত কিছুই না ঘটে যাই,
একেকটা জীবনের সাথে
একেকটা মনের অজান্তে।
শুধু পরে থাকে সকল কথা তৈরির শব্দগুলো,
নিরন্তর কথা বলে অনুভবের শীর্ষক হয়ে।

লেখক : দ্বাদশ শ্রেণি
কর্ণফুলী ডিগ্রি কলেজ।

প্রাণের প্রিয় শরৎকাল

- জ্বলন তারা তঞ্চঙ্গ্যা

ওহে আমার প্রাণের প্রিয় শরৎ
আসবে তুমি কবে?
তোমারী আগমনে ধন্য হলাম আমি,
নদীর দুইকুলে কাঁশফুল দেয়ার জন্য।
তোমারী আগমনে ধন্য হয় আকাশ,
চাঁদ, তারা, ফুল ফল আরো ধন্য বাতাস।
হতাম যদি প্রাণের প্রিয় কবি,
ঋতু বৈচিত্র্য কবি জীবনানন্দ দাশের মতো-
তোমায় নিয়ে কবিতা লিখতাম আরো গল্প বানাতাম কতো
ঠিক যেন তার ভালোবাসা নাটোরের বনলতা সেনের মতো।
তোমার রূপে মুগ্ধ আমি অপেক্ষায় আসি কতো
মেঘ মুক্ত আকাশ চাঁদ ও তারা আছে যতো।
তাইতো বলি তোমায় শরৎ
তুমি আমার ভালোবাসার একটুখানি পরশ।

লেখক : রাঙ্গামাটি সরকারী মহিলা কলেজ।

পাহাড়

- মঞ্জুর তঞ্চঙ্গ্যা

পাহাড় তুমি আমার মা
তুমিই আমার- মাতৃভূমি।
তোমার জন্য- কত না- স্বপ্ন-
বুকে- ধরে রাখি।
তোমার কোলে জন্ম নিয়ে
ধন্য জীবন আমার।
তাইতো তোমায় নিয়ে গর্ব করি
আমার দেখা-পাহাড়।

তোমার কোলে বসত করে-
হাজারো- পাহাড়ি।
ঝরনা, নদী- সবই- তোমার
হাজারো জলরাশি-
তাইতো তোমার- বুকেই বাস করে
নাম পেয়েছি পাহাড়ি।

লেখক : দ্বাদশ শ্রেণি
কর্ণফুলী ডিগ্রি কলেজ

স্কুলের ছেলে

- বিমল তঞ্চঙ্গ্যা

ভালোলাগে আমার গ্রীষ্মের সকালে উঠতে
যখন প্রতিটি গাছে পাখিরা গান গায়,
দূরের- শিকারি তার- শিস বাজায়
আর ভরত পাখি- আমার সাথে গেয়ে ওঠে;
আহ! কী মধুর সঙ্গ!
কিন্তু গ্রীষ্মের ভোরে স্কুলে যাওয়া,
ওহ, মাটি করে দেয় সব আনন্দ!
নির্দয় এক জীর্ন চোখের শৃঙ্খলে,
ছোট্ট শিশুদের দিনটা কাটে
দীর্ঘশ্বাস আর হাসি-খুশিতে।
আহা তারপর কখনো বা
ভগ্নমনে বসে থাকি,
আর অজস্র উদ্বেগের সময় পার করি;
না পারি বইয়ে আনন্দ নিতে,
পারি বসতে- শিক্ষাকুঞ্জে,
ক্লান্তি পূর্ণ- যেন ছেড়াছিন।

লেখক : ছাত্র, এইচএসসি পরীক্ষার্থী
কর্ণফুলী ডিগ্রি কলেজ

প্রতিজ্ঞা

- সুহেল তঞ্চঙ্গ্যা

সত্য কথা বলতে যদি
মার খেতে হয় খাব
মিথ্যাবাদীর কবর দিয়ে
সত্য বলে যাব।
মিত্র যদি শত্রু হয়
তবুও ন্যায়ের পথে রবো।
ধর্মের পথে সুখে দুঃখে
জীবন গড়ে নেব
দেশের জন্য প্রয়োজনে
জানটা দিয়ে দেব।
কষ্টে যাদের জীবন গড়া
তাদের পাশে রবো
গরীব, দুঃখী, মেহনতির
কাছের মানুষ হবো।

লেখক : এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী
কর্ণফুলী ডিগ্রি কলেজ

আমি আর আমার স্বপ্ন

- শুভমিতা তঞ্চঙ্গ্যা

মেঘের ডানায় স্বপ্ন আমার
উদাস মনের আমি
ছোট্টবেলা থেকেই ছিলাম
বাবার কাছে দামি॥

মা দিত বকা, বাবা করত আদর,
তবে মা-বাবা দুজনেই নিত আমার খবর।
মা চাই খারাপ বন্ধুর সাথে যেন করি না মিল
বাবা চাই সমাজে যেন উচ্চ করি শির।

তবে দুজনেই চায় আমার ভালো
তাই আমিও চাই হতে,
এই সমাজের আলো ॥

লেখক : এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী
বান্দরবান সরকারী মহিলা কলেজ

জাতি আমার তঞ্চঙ্গ্যা

- বিজয় তঞ্চঙ্গ্যা

হে জাতি আমার
তোমার রূপ নেই
নেই প্রাণ, নেই আকার, নেই ওজন
আছে শুধু ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য
তার সাথে জড়িয়ে আছে আমার জীবন।
তুমি দিয়েছ আমায় ভাষা, গোত্র, জাতি, বংশের পরিচয়
তোমার জন্য করিব শিক্ষার সঞ্চয়,
শিক্ষা বলে জাতির মেরুদন্ড
মেরুদন্ড দিয়ে তোমরা করবে বিশ্বে পরিচিতি
জাতি আমার ক্ষুদ্র
তাই বলে কী জাতি জ্ঞানই ক্ষুদ্র?
খাতাই নই, পাথরে নই
লিখে রাখিব তোমারে হৃদয়ে এই
জাতি আমার তঞ্চঙ্গ্যা।
তোমাকে আমরা ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে
নিয়ে যাবে বিশ্ব দরবারে!
বিশ্ব বলবে; হে বিশ্ব জননী!
দেখেছ কে এসেছে?
জাতি রূপ দেখে বলবে
বিশ্ব জননী লিখে রাখো গিনেস বুকে
হ্যাঁ, বললে আমরা থাকি সুখে।
জাতি আমার রক্ষা ও আমার
আদি সৃষ্টি ছিল শিলালিপি তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণ।
তুলে রাখব শিলাই নই, স্বর্ণের কাগজে
সেই কাগজে আরও ইতিহাসবিদরা লিখবে
জাতি ইতিহাসের কথা,
দেখবে জাতি পড়বে মানুষ তোমার কথা।
হে জাতি আমার তঞ্চঙ্গ্যা।

লেখক : এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী (বিজ্ঞান)
রাঙ্গুনিয়া সরকারী কলেজ

মানবতা

- নয়ন বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা

এসো ভাই, এসো বোন,
সবাই মিলে বন্ধুতের মাঝে গড়ে তুলি
একটি সুন্দর মানবসেবার সংগঠন।
দিয়ে দিই তার নাম,
রক্তের ফেরিয়ালার মানব সেবার সংগঠন॥

সেখানে থাকবে না হানা-হানি,
থাকবেনা- অশৃঙ্খলা বোধ
থেকে যাবে মানুষের
ভালোবাসা আর মৈত্রী।
রেখে যাবে একতা,
সবাই মিলে দেখাব মানবতা।

জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে,
রক্ত দিব হেসে হেসে।
রক্ত দিতে নেই কোন ভয়
নতুন প্রাণের সঞ্চয়।
বাঁচবে রোগী হাসবে প্রাণ
ঝর-বৃষ্টি তুফান,
থামাতে পারব না রক্তের দান।

লেখক : একাদশ শ্রেণি
রাঙ্গামাটি পাবলিক কলেজ

স্বপ্নের আহ্লাদ

- শোভা তঞ্চঙ্গ্যা

নব নব স্বপ্নের জাগরণ
গড়ে উঠুক সবার মনে,
জানি, স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাই
তবুও স্বপ্নের সমাবেশ ঘটে মানব জীবনে।
তাই বলি, জুম্ম জাতির স্বপ্ন ছিলো
নিরব ভালোবাসা আর দুঃখের সাথী,
হ্যাঁ, কেউ বলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী
কিন্তু, মনে বড় যে জাতি, সে জাতিই বড় জাতি।
পৃথিবীতে একজন ভিখারীর স্বপ্ন ছিলো
এক মুঠো ভাতের জন্য অপেক্ষা,
অন্যদিকে বিলাসিতা বড় লোকের স্বপ্ন ছিলো
কবে পাবো দালানকোঠা ঘর আর দামি গাড়ি।
জানি স্বপ্নের সারণীতে মানুষ একনয়
তবুও এড়িয়ে চলবো বিলাসিতা স্বপ্নতে,
তাই আমার স্বপ্নের আহ্লাদ হলো
সকল জুম্ম জাতি স্মরণ করুক মানবেন্দ্র
লারমাকে।

লেখক : রাঙ্গামাটি সরকারি মহিলা কলেজ

.....বিষু

- মনজলিকা তঞ্চঙ্গ্যাঁ

স্বপ্নীল রঙে মাখা
বর্ণিল সাজে সাজানো
ঐতিহ্যের ধারাতে
শয়নে স্বপনের একটি নাম
..........বিষু।
তোমারি প্রতীক্ষায়, তোমারি প্রেরণায়
কত স্বপ্ন, কত রঙ জেগে থাকে
সবারি চেতনায়
তুমিই সেই প্রতিটি একটি নাম
..........বিষু।
তুমি আসবে বলে প্রেয়সী জুম্মবী
সেজে বসে বুনেছে স্বপ্ন আনমনে
প্রেম মাখা হৃদয়ে আপন মাধুর্য্যে
অযাচিত ভালোবাসায় ভরা
তুমিই সেই বিষু।
তুমি আসবে বলে,
অপার প্রহর গুনা
ভূলে যাবো সেই দিনে
মনের তিক্ততার কালিমা
জড়াবো বলে সকলকে একতার বাধনে
তুমিই সেই এক পবিত্র লগন
তুমিই সেই বিষু।
তুমিই সেই উৎসব আমেজের ভরা
সংস্কৃতির পূর্ণতা লাভের
গর্বের গর্বিত একটি শব্দ
সেই দিনের আগমনে ঘটে
মানবের মহা মিলন
সেই তুমিই বিষু।

লেখক : ছাত্রী, রাজস্থলী কলেজ

মুক্তির সন্ধানে

- মিতা তঞ্চঙ্গ্যা

থাকতে চাইনা আমি অনিত্য সংসারে।
লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাসে পরিপূর্ণ মায়াজালে।
দুঃখ থেকে মুক্তির আশায়,
ছুটে চলি অনিত্য ভাবনায়।
টাকা-পয়সা, ধন-দৌলতে ভেসে থাকি জোয়ারে,
মায়া-মমতা, হিংসা, অহংকারে মনকে রাখি আবদ্ধ করে।

তবে কী পাবো মুক্তির সন্ধান?
যেতে কী পারবো ছেড়ে মায়াজাল
যেতে কী পারবো তৃষ্ণাক্ষয়ে ভবপারে
আমি চাইনা অহংকার, চাইনা হিংসা
চাইনা ভোগ-বিলাস, লোভ-লালসা।
আমি চাইনা ধন-দৌলত, টাকা আর পয়সা,
চাই শুধু মৈত্রীময় চিত্ত।
চাই শুধু সকল জীবের মঙ্গল আর হিতসুখ
চাই শুধু মুক্তি।
মায়াজাল ত্যাগ করে তৃষ্ণাক্ষয়ে
যেতে চাই ভবপারে
সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ত্যাগ করে
অনিত্য সংসার ছেড়ে যেতে চাই ভবপারে
তাই সবকিছু পিছু ফেলে পিপাসু প্রাণির মতো
খুঁজে চলেছি মুক্তির সন্ধানে।

লেখক : একাদশ শ্রেণি
কর্ণফুলি ডিগ্রী কলেজ
হরিনছড়া, কাপ্তাই।

চাইলেনের আলো

- শান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

যে পাতায় তঞ্চঙ্গ্যাঁর পরিচয় মেলা থাকে,
সে পাতার নাম চাইলেন
যারা জ্ঞানী, তারা পড়ে; সেই জ্ঞানের বই,
তঞ্চঙ্গ্যাঁর জাতির জীবন ও তঞ্চঙ্গ্যাঁ শিক্ষা
সাহিত্য-সংস্কৃতি ঐতিহ্য নিয়ে
যেখানে ছাপানো হয় তার নাম চাইলেন
তখন মানুষ বলে, কোথায় পাবো তারে,
স্কুল ও কলেজ থেকে মানুষ পাবে তারে
যে পাতায় তঞ্চঙ্গ্যার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য নিয়ে পড়ে
তারাই হবে তঞ্চঙ্গ্যা আলোয়- আলোকিত বিজ্ঞজন,
চাইলেন মানে তঞ্চঙ্গ্যাঁর জ্ঞানের আঁধার
সে জ্ঞানের আলোয় মহিমান্বিত হতে এসো
সবার প্রিয় চাইলেনের দুয়ারে॥

লেখক : ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী
বিলাইছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

জ্ঞানের পিপাসু

- হিরামন মারমা

তুমি খুব দামী, তুমি খুব দুর্লভ
তুমি খুব শান্ত, নির্ভীক তুমি
তোমার খুঁজে ....
অনেক মানুষ হয়ে গেছে দিশেহারা
পথের সন্ধান খুঁজতে গিয়ে পায় যেমন পথিক
তেমনি আমিও তোমার আলোর সন্ধানীর,
এক আলোকিত জ্ঞানের অভিযাত্রিক।
তাইতো লক্ষ মানুষ, তোমার পিপাসু হয়ে
খুঁজে বেড়াচ্ছে হাজারো বইপুস্তকে।
হীরার মতো মহা মূল্যবান তুমি,
তারার মতো উজ্জ্বল নক্ষত্র।
তোমার এই প্রতিশ্রুতি থাকবে চির অম্লান,
তাইতো জ্ঞান তোমাই জানাই,
আলোকিত সোনালী নতুন আহ্বান।

লেখক : শহীদ আব্দুর রউফ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশাল।

সৃষ্টিকর্তা

- আপনবাবু তঞ্চঙ্গ্যা

সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন,
আলোকিত জ্ঞান লাভের জন্য।
সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন,
মানুষের প্রতি দয়াশীল হওয়ার জন্য।
সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন,
আলোকিত সমাজ গড়ার জন্য।
সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন,
মৈত্রীময় চিত্ত নিয়ে শীল, বিনয় পালন করার জন্য।
সৃষ্টিকর্তা হীতসুখ ও মঙ্গল কামনা করেছেন,
জগতের সকল প্রাণীর জন্য।
সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে গড়েছেন,
একে অপরের ভালোবাসার জন্য।
সৃষ্টিকর্তা আমাদের পথ দেখিয়েছেন,
দুঃখ হতে মুক্ত হওয়ার জন্য।
সৃষ্টিকর্তা তাই এক অদৃশ্য স্রষ্টা,
যিনি এই পৃথিবীকে রেখে গেছেন সবকিছুর জন্য।

লেখক : নবম শ্রেণি (ভোকেশনাল)
রাঙ্গুনিয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

মোদের স্বপ্নগুলো কোন পথে?

- মিসাইন মার্মা (এ্যানি)

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান
হাসি-কান্নার ইতিহাস নিয়ে মোদের পার্বত্য চট্টগ্রাম
অসংখ্যা নদী নালা সবুজ বনানী ঘেরা ঘাস
এইখানে রয়েছে মোদের আদিবাসী জুম্মজাতির বসবাস
ভিন্ন মোদের সংস্কৃতি, এতিহ্য ভিন্ন মোদের ভাষা
স্বাধীন অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকা এইতো মোদের আশা
মানুষের মতো মানুষ হওয়া স্বপ্ন মোদের মনে
কিন্তু কেন ভেঙে যায় সেই স্বপ্ন ক্ষণে ক্ষণে
স্বাধীন দেশের আদিবাসী হয়ে পারি না কি এতটুকু আশা
পাবো নাকি একটুকু সুখের নির্মল সুবাতাস?
নাকি এই স্বপ্ন দেখাটায় মোদের দন্ডনীয় অপরাধ
অথচ শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হয় অনেক বছর আগে
আজও কি পেরেছি সেই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে
আজও কি পেরেছি এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে
আজও শান্তিকামী মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে ব্যর্থ
তাইতো প্রশ্ন আমাদের স্বপ্নগুলো কোন পথে পরিচালিত
পারব কি নির্যাতিত সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে
অন্ধকারাচ্ছন্ন, দিশেহারা মানুষের আলোর পথ দেখাতে।
অবশ্যই পারব একজন অগ্রগামী তরুন ছাত্র হিসেবে
তাইতো দরকার নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গড়তে
অবশ্যই পারব একদিন মোদের স্বপ্ন পূরণ করতে।

লেখক : ছাত্রী, নবম শ্রেণি
রাজস্থলী তাইতং পাড়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

মায়ের প্রতি ভালোবাসা

- মিথুন তঞ্চঙ্গ্যা

জননী মাগো
তোমায় আমি কত ভালোবাসি,
ছোটবেলা ভালোবাসা দিয়ে তুমি লালন পালন করেছো।
আমি কি সেই তোমার বৃদ্ধের জীবনে,
ভালোবাসা কর্তব্য পালন করবো না,
এখনি শিক্ষার আলোর জন্য
কত দূরে আছি।
তবু মনে হয় আমি তোমার কাছে
সেই ছোট বেলা খোকার মতো কাছে আছি।
মনে পড়ে যখন, তোমাকে
তোমার সাথে টেলিফোনে কথা বলি,
তোমার ধরাজ কণ্ঠ শুনে
আমার হৃদয়ে কান্না এসে যায়।
সেই মধুর সুরে কথা
সকালে রিং টোন হিসেবে কানে বাজে
দিবা স্বপ্নের মতো ঘুম ভেঙে যায়।
মা আমি তোমাকে এত ভালোবাসি,
ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি
মা আমার।

লেখক : শ্রেণি : সপ্তম
গ্রাম: গাছ কাটা ছড়া

ঐতিহাসিক চিঠি

বিশ্বজিৎ তঞ্চঙ্গ্যা

মহাশয়,

আমার পুত্রকে জ্ঞানার্জনের জন্য আপনার কাছে প্রেরণ করলাম। তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন এটাই আপনার কাছে আমার বিশেষ দাবী। আমার পুত্রকে অবশ্যই শেখাবেন- সব মানুষই ন্যায় পরায়ন নয়, সব মানুষই- সত্যনিষ্ঠা নয়। তাকে এও শেখাবেন- প্রত্যেক বদমায়েশের মাঝে ও একজন বীর থাকতে পারে। প্রত্যেক স্বার্থপর রাজনীতিকের মাঝে ও একজন নিঃস্বার্থ নেতা থাকে। তাকে শেখাবেন- পাঁচটি ডলার কুড়িয়ে পাওয়ার চেয়ে একটি উপার্জিত ডলার অধিক মূল্যবান। এও তাকে শেখাবেন কিভাবে পরাজয়কে মেনে নিতে হয় এবং কিভাবে বিজয়োল্লাস উপভোগ করতে হয়। হিংসা থেকে দূরে থাকার শিক্ষাও তাকে দেবেন। যদি পারেন নীরব হাসির গোপন সৌন্দর্য তাকে শেখাবেন। সে যেন আগেভাগেই একথা বুঝতে শেখে- যারা পীড়নকারী তাদেরকেই সহজে কাবু করা যায়। বইয়ের মাঝে কি রহস্য লুকিয়ে আছে, তাও তাকে বুঝতে শেখাবেন। আমার পুত্রকে শেখাবেন- বিদ্যালয়ে নকল করার চেয়ে অকৃতার্য হওয়া অনেক বেশি সম্মানজনক। নিজের উপর তার যেন সুমহান আস্থা থাকে। এমনকি সবাই যদি সেটাকে ভুলও মনে করে। তাকে শেখানে- ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্র আচরণ করতে, কঠোরদের প্রতি কঠোর হতে। আমার পুত্র যেন এই শক্তিপায়- হুজুগে মাতাল জনতার পদাঙ্ক অনুসরণ না করার। সে যেন সবার কথা শোনে এবং তা সত্যের পর্দায় ছেঁকে যেন ভালটাই শুধু গ্রহণ করে- এ শিক্ষাও তাকে দেবেন। সে যেন শিখে দুঃখের মাঝে কিভাবে হাসতে হয়। আবার কান্নার মাঝে লজ্জা নেই একথা তাকে বুঝতে শেখাবেন। যারা নির্দয়, নির্মম তাদেরকে সে যেন ঘৃণা করতে শেখে আর অতিরিক্ত আরাম আয়েশ থেকে সাবধান থাকে।

আমার পুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করবেন কিন্তু সোহাগ করবেন না কেননা আগুনে পুড়েই ইস্পাত খাঁটি হয়। আমার সন্তানের যেন অধৈর্য হওয়া সাহস না থাকে, থাকে যেন তার সাহসী হওয়ার ধৈর্য। তাকে এ শিক্ষা ও দেবেন- নিজের প্রতি তার যেন সুমহান আস্থা থাকে আর তখনই তার সুমহান আস্থা থাকবে মানব জাতির প্রতি।

ইতি
আপনার বিশ্বস্ত আব্রাহাম লিংকন

লেখক- ২০১৮ সালের এস.এস.সি পরিক্ষার্থী, রানী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি।

তথ্যসূত্র : সাবেক- আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন তার পুত্রের শিক্ষকের কাছে লেখা চিঠি, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০২ইং "বিশ্ব শিক্ষক দিবস" উপলক্ষে প্রথম আলো" পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি

সংগ্রহে- জীবক তঞ্চঙ্গ্যা

১। সাফল্যে ৩টি শর্তঃ
- অন্যের থেকে বেশী জানুন!
- অন্যের থেকে বেশী কাজ করুন!
- অন্যের থেকে কম আশা করুন! - উইলিয়াম শেক্সপিয়ার।

২। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর তারপর অন্যকে অনুশাসন কর নিজে নিয়ন্ত্রিত হলে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাই কঠিন- গৌতম বুদ্ধ।

৩। হ্যাঁ এবং না কথা দুটো সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে ছোট। কিন্তু এ কথা দুটো বলতে সবচেয়ে বেশি ভাবতে হয়।- পীথা গোরাস।

৪। এই পৃথিবী কখনো খারাপ মানুষের খারাপ কর্মের জন্য ধ্বংস হবে না। যারা খারাপ মানুষের খারাপ কর্ম দেখে ও কিছু করেনা তাদর জন্য পৃথিবী ধ্বংস হবে।- আইনস্টাইন।

৫। যদি সর্বোচ্চ আসন পেতে চাও, তাহলে নিম্নস্থান থেকে আরম্ভ কর।- সাইরাস।'

৬। যাহা তুমি দেখাও। তার চেয়ে বেশি তোমার থাকা উচিত। যা তুমি জান, তার তুলনায় কম কথা বলা উচিত।- উইলিয়াম সেক্সপিয়ার।

৭। সময় বেশী লাগলেও ধৈর্য সহকারে কাজ কর। তাহলে প্রতিষ্ঠা পাবে।- ডব্লিউ এস ন্যান্ডের।

৮। যে মন খুলে হাসতে পারে না। সেই পৃথিবীতে সবচেয়ে অসুখী।- জন লিলি।

৯। ভাগ্য বলে কিছুই নেই, প্রত্যেকের চেষ্টা ও যত্নের উপর তা গড়ে উঠে। স্কট।

১০ প্রত্যেককে বিশ্বাস করা বিপদজনক; কিন্তু কাউকে বিশ্বাস না করা আরো বেশী বিপদজনক।- আব্রাহাম লিংকন।

১১। সেই সত্যিকারের মানুষ যে অন্যের দোষক্রটি নিজেকে দিয়ে বিবেচনা করতে পারে।- লর্ড হ্যলি ফক্স।'

১২। কোনবিষয়ে প্রস্তাব করা সহজ, কিন্তু নির্বাহ করে ওঠা কঠিন।- ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার।

১৩। যে ভালবাসা যত গোপন, সেই ভালোবাসা তত গভীর।- হুমায়ুন আহমেদ।

১৪। সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।- চন্দী দাস।

১৫। এমনভাবে অধ্যায়ন করবে, যেন তোমার সময়াভাব নেই, তুমি চিরজীবি, এমনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে, যা মনে হয় তুমি আগামীকলই মারা যাবে।- মহাত্মা গান্ধী

১৬। ভালো বই পড়া মানে গত শতাব্দীর সেরা মানুষের সাথে কথা বলা।- দেকার্তে

১৭। যদি মনে কর তুমি পারবে, কিংবা মনে কর তুমি পারবেনা, দুই ক্ষেত্রেই তোমার বিশ্বাস সঠিক।- হেনরি কোড

১৮। বিশ্বে দুটি শক্তি রয়েছে- এগুলো হচ্ছে অসি ও মন। কিন্তু পরিনামে এ দুয়ের দ্বন্ধের মনের কাছে অসি শেষ পর্যদস্ত হয়।- নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

ছাত্র, একাদশ, (ব্যবসায় শিক্ষা)
রাঙ্গামাটি পাবলিক কলেজ।


শিক্ষা
সাহিত্য
সংস্কৃতি
চাৌলেন
(তঞ্চঙ্গ্যা শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক বিষু প্রকাশনা)
বিষু/২০১৮ খ্রিঃ উপলক্ষ্যে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
প্রথম সংখ্যা
দ্বিতীয় সংখ্যা
তৃতীয় সংখ্যা
চতুর্থ সংখ্যা
পঞ্চম সংখ্যা
ষষ্ঠ সংখ্যা
"পঞ্চম বছর পেরিয়ে ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ"
চাৌলেন শুধু তঞ্চঙ্গ্যা সাহিত্য প্রকাশনা নয়,
অনলাইন ভিত্তিক প্রকাশনাও। যেখানে আদিবাসীর
বিভিন্ন অধিকার বিষয়ে লেখালেখি হয়।
চাৌলেন প্রকাশনা পর্ষদ,
রাঙামাটি সরকারি কলেজ।
যোগাযোগের ঠিকানাঃ
দিগন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, সম্পাদক, চাৌলেন প্রকাশনা পর্ষদ, রাঙামাটি সরকারি কলেজ।
মোবাঃ ০১৫৫৮৯৪৮৪৩২, ফেইসবুক পেইজ : চাৌলেন প্রকাশনা পর্ষদ।